জীবন বড় বেগবান

প্রফুল্ল রায়

সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৬৫

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
প্রদীপকুমার সাহা
লোকনাথ বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৪বি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

অমল চক্রবর্তী
অনুজপ্রতিমেষু

এক

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের মর্নিং ফ্লাইটের যাত্রীদের কলকাতায় পৌঁছুবার কথা সকাল সাড়ে আটটায়। যান্ত্রিক গোলমালে বম্বে থেকে প্লেন ছাড়তে দেরি হয়ে গিয়েছিল, ফলে আট ঘন্টা বাদে সেটা যখন দমদমে ল্যান্ড করল, সাড়ে চারটে বেজে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এয়ারলাইনসেরই একটা লাক্সারি কোচে এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ে চলে আসে শমিতা। ততক্ষণে প্লেনের পেট থেকে যাত্রীদের লাগেজ বার করে এনে কনভেয়র বেল্টে চাপাতে শুরু করেছে পোর্টাররা। আধ ঘণ্টার ভেতর নিজের সুটকেসটা তুলে বাইরে আসতেই সে দেখতে পেল সুবিশাল লাউঞ্জটা প্রায় ফাঁকা। যাকে বলা হয় গেটওয়ে টু ইস্টার্ন ইন্ডিয়া অর্থাৎ পূর্ব ভারতের প্রবেশ পথ, অন্যদিন সেই দমদম এই সময়টা গমগম করতে থাকে। বিকেলের দিকের ফ্লাইট ধরে যারা দিল্লি বম্বে পাটনা বা লখনৌ যেতে চায় তাদের ভিড়ে পা ফেলা মুশকিল হয়ে ওঠে। আজ প্যাসেঞ্জার খুব কমই চোখে পড়ছে। এধারে ওধারে মাত্র কয়েকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। এয়ারপোর্টের একজন ইউনিফর্ম-পরা কর্মীকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, দুপুরে যাত্রীদের সঙ্গে প্লেন দেরিতে ছাড়া নিয়ে এখানে প্রচণ্ড গণ্ডগোল হয়। তাতে আজকের মতো ক'টা ডোমেস্টিক ফ্লাইট বা অন্তর্দেশীয় উড়ান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এত বড় লাউঞ্জটা তাই এখন সুনসান, নিঝুম।

শমিতা আর দাঁড়ায় না, ডান পাশে লাউঞ্জের শেষ মাথায় যে গেটটা, সেদিকে এগিয়ে যায়। ওটা দিয়ে বাইরে বেরুলেই একধারে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, আরেক দিকে প্রাইভেট কারের পার্কিং জোন। আগেই ফোন করে শমিতা অফিসে জানিয়ে রেখেছিল, রামেশ্বর সিংকে যেন গাড়ি দিয়ে এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রামেশ্বর তাদের কোম্পানির ড্রাইভার। লোকটা চৌকস। সে নিশ্চয়ই সকালে এসেছিল। আশা করা যায় প্লেন লেট দেখে এবং ঠিক

কখন সেটা পৌঁছুবে, সেই খবরটা নিয়ে এ বেলা ফের এসে অপেক্ষা করছে। যদি না এসে থাকে ট্যাক্সি নিতে হবে।

শমিতার বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। গায়ের রং আশ্বিনের রৌদ্রঝলকের মতো, মসৃণ ত্বক। দারুণ সপ্রতিভ চেহারা। চোখ দু'টি বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝকঝকে। হাইট পাঁচ ফিট সাত কি আট ইঞ্চি হবে। চুল ছেলেদের মতো করে ছাঁটা। গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের যে চেহারাটা চোখের সামনে ভাসে তার সঙ্গে শমিতাকে কোনো দিক থেকেই মেলানো যাবে না।

তার পরনে সাদা জিনস এবং হাতা-গোটানো ঢোলা শার্ট। রুপোর চেনে-বাঁধা চশমা বুকের ওপর ঝুলছে, খুব কম সময়ই ওটা চোখে থাকে। পায়ে উঁচু হিলের জুতো।

চলতে চলতে একবার এনকোয়ারি কাউণ্টারটার দিকে চোখ চলে যায় শমিতার। ওখানে সুরজিৎ সোম একজনের সঙ্গে কথা বলছে।

সুরজিৎ 'ইস্টার্ন হেরাল্ড' কাগজের তুখোড় সাংবাদিক। ট্রেড; কমার্স, ইন্ডাস্ট্রি, শেয়ার বাজার ইত্যাদি নিয়ে লেখালিখি করে। খবরের খোঁজে সে চেম্বার অফ কমার্স, স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে নানা কর্পোরেট অফিস পর্যন্ত সর্বত্র চষে বেড়ায়। মাঝে মাঝে শমিতাদের অফিসেও হানা দেয়। সেখানেই তার সঙ্গে সুরজিতের আলাপ। হয়তো কোনো দরকারে সে এয়ারপোর্টে এসেছে।

সুরজিতের বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। কালো হলেও বেশ সুপুরুষ। স্বাস্থ্যও চমৎকার। এমনিতে খুব ভদ্র, মার্জিত, তবে একটু ফাজিল ধরনের।

সুরজিৎও শমিতাকে দেখতে পেয়েছিল, হাত তুলে হাসল। শমিতাও বাঁ হাত তুলে হাসে।

সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, 'কোত্থেকে ?'

শমিতা বলে, 'বম্বে।'

'কাল পরশু আপনাদের অফিসে আসছি।'

'আসবেন।'

'কখন গেলে আপনার সঙ্গে খানিকটা সময় নিয়ে কথা বলা যাবে ?'

'এনি টাইম আফটার লাঞ্চ।'

শমিতা থামে না, লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায়। আসলে সে ভীষণ

ক্লান্ত। মনে হচ্ছে হাত-পায়ের জোড় যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। কাঁধে পিঠে হাঁটুতে রীতিমতো যন্ত্রণা। এখন দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে কথা-টথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

বম্বেতে সে ছিল তিনটে দিন। উঠেছিল মেরিন ড্রাইভের একটা ফাইভ-স্টার হোটেলে কিন্তু হোটেলের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল খুব সামান্যই। বম্বেতে সে বেড়াতে যায়নি, এটা প্রমোদ-ভ্রমণ নয়। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত তার কেটে গেছে ঝড়ের গতিতে।

শমিতা একটা বিরাট ফার্মের টপ সেলস একজিকিউটিভ। তাদের কোম্পানি তৈরি করে নানা ধরনের রেনকোট, ম্যাকিনটশ অর্থাৎ বর্ষাতি। সারা দেশ জুড়ে এগুলোর বিপুল চাহিদা। কিন্তু তারা তো শুধু একাই এ ধরনের জিনিস বানায় না, আরো অজস্র কোম্পানি আছে। কাজেই প্রতিযোগিতাটা প্রচণ্ড। তৈরি বাজার যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় সে জন্য আজ দিল্লি, কাল বম্বে, পরশু হায়দ্রাবাদ করে বেড়াতে হয় শমিতাকে। তাদের অফিস তার পায়ে দু'খানা চাকা জুড়ে ছেড়ে দিয়েছে, একটা দিনও তার স্থির হয়ে বসে থাকার উপায় নেই। অবিরত সে ছুটছেই, ছুটছেই।

মাস ছয়েক হলো তাদের কোম্পানি ইতালির একটা বিশাল মাল্টি-ন্যাশনাল ফার্মের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সিনথেটিকের সুটকেস, অ্যাটাচি কেস এবং নানা শেপের বক্স তৈরি শুরু করেছে। কলকাতায় এই নতুন জিনিসগুলোর ভাল বাজার পাওয়া গেছে। এবার তারা সারা দেশের মার্কেট দখল করতে চায়। কলকাতার পর তাদের লক্ষ্য বম্বে। যদিও আরব সাগরের পারের ঐ শহরটায় তাদের একটা ব্রাঞ্চ অফিস আছে কিন্তু ওদের ওপর নতুন প্রোডাক্টের সেলস প্রোমোশনের মতো এত বড় কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায় না, তাই তিন দিন আগে শমিতাকে বম্বে যেতে হয়েছিল। মাঝরাতের পর কয়েকটা ঘণ্টা বাদ দিলে সারদিন বড় বড় ডিলারদের লাঞ্চ বা ডিনারে ডেকে কথা বলেছে সে, প্রেস কনফারেন্স করেছে, খবরের কাগজ, রেডিও আর স্থানীয় টিভিতে তাদের নতুন প্রোডাক্টগুলোর প্রচার কিভাবে করা যায়, একটা নাম-করা বিজ্ঞাপন এজেন্সির সঙ্গে তাই নিয়ে ছকও করে ফেলেছে। যেটুকু সাড়া পাওয়া গেছে তা রীতিমতো উৎসাহজনক। আশা করা যায়, বম্বেকে মাঝখানে রেখে তাদের সুটকেস-টুটকেস পশ্চিম ভারতে হই হই করে ঢুকে পড়বে। মোট

কথা, এই তিনটে দিন তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে।

শমিতা লাউঞ্জের শেষ মাথায় সেই দরজাটার কাছে যখন চলে এসেছে, হঠাৎ ফোঁপানির আওয়াজ কানে আসে। সঙ্গে চাপা গলার হুমকি, 'চুপ রহো, বিলকুল চুপ—'

প্রথমটা সেভাবে কান দেয়নি শমিতা। নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু ফোঁপানিটা বাড়তেই থাকে। সেই সঙ্গে শাসানিটা চলছেই।

এবার চমকে থেমে যায় শমিতা। মুখ ফেরাতেই দেখতে পায়, বাঁ ধারে সারি সারি যে চেয়ারগুলো রয়েছে সেখানে একটা ষোল সতের বছরের দারুণ সুন্দর মেয়ে অঝোরে কেঁদে চলেছে। তার দু'চোখ লাল, সারা মুখ চোখের জলে মাখামাখি। মেয়েটি এতই ভীত এবং আতঙ্কগ্রস্ত যে সমানে কাঁপছে। তাকে ঘিরে রয়েছে তিনটে নিরেট চেহারার লোক। তাদেরই একজন খুনের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটা কান্নায় বুজে যাওয়া গলায় বলে, 'আমাকে ছেড়ে দ্যান, আপনাদের পায়ে পড়ি—'

আরেকটি লোক গজরানির মতো আওয়াজ করে বলে, 'জবান বন্ধ্ কর—'

মেয়েটি থামে না। বলে, 'আমারে বাড়িতে দিয়া আসেন।'

সেই লোকটা শুধু বলে, 'বিলকুল চোপ।'

মেয়েটি যত সুন্দরীই হোক, সে যে গ্রামের মেয়ে এবং বাঙালি সেটা বোঝা যাচ্ছিল। তার সঙ্গীরা কিন্তু সবাই আদ্যোপান্ত অবাঙালি। এরকম একটা গেঁয়ো কিশোরী বা যুবতী ঐ লোকগুলোর সঙ্গে কী করে এই এয়ারপোর্টে এলো বোঝা যাচ্ছে না। সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমেলে এবং সন্দেহজনক। তবে সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কারণ হলো ঐ লোকগুলোর হুমকি।

প্রায় দু-আড়াই শ' বার এই এয়ারপোর্ট দিয়ে যাতায়াত করেছে শমিতা কিন্তু এমন দৃশ্য আগে আর কখনও চোখে পড়ে নি। বিশেষ করে এমন প্রকাশ্য দিবালোকে।

হলিউডের ছবিতে মাঝে মাঝে এয়ারপোর্টে কিডন্যাপিংয়ের দমবন্ধ-করা দৃশ্য থাকে, কিন্তু ভারতের কোনো বিমানবন্দরে এসব ভাবাই যায় না। ঐ লোক তিনটে মেয়েটাকে কোন উদ্দেশ্যে এখানে নিয়ে এসেছে ? কিছুদিন আগে

দিল্লি এয়ারপোর্টে মিডল ইস্টের মধ্যবয়সী একটি রইস লোককে ধরা হয়েছিল। সে লখনৌয়ের এক কিশোরীকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই লোকগুলোরও কি সেইরকম কোনো বদ মতলব রয়েছে?

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মেয়েটি হঠাৎ শমিতাকে দেখতে পেয়ে যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। এক ঝটকায় শরীরটাকে টেনে তুলে বলে, 'আমারে বাঁচান মেমসাহেব, আমারে বাঁচান—' তার গলার ভেতর থেকে আর্ত চিৎকারের মতো শব্দগুলো বেরিয়ে আসে।

তার সঙ্গীরাও লাফ দিয়ে উঠে তিন দিক থেকে ঘিরে হল্লা বাধিয়ে তাকে থামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েটি তাদের ধাক্কা মেরে এগিয়ে আসতে থাকে আর একনাগাড়ে চেঁচিয়ে যায়, 'বাঁচান—বাঁচান—'

শমিতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চকিতে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায় যেন। সুটকেস আর ব্যাগটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে সে ওদের দিকে ছুটে যায়। বলে, 'কী হয়েছে?'

তার প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই অভাবনীয় একটা ব্যাপার ঘটে যায়। লোক তিনটে মেয়েটিকে ধরে টানতে টানতে প্রকাণ্ড লাউঞ্জের উল্টোদিকে 'একসিট' লেখা একটা দরজার দিকে দৌড়ুতে শুরু করে। মেয়েটি যাবে না, সে মেঝেতে বসে পড়ে অনবরত বাধা দিচ্ছে আর একটানা কাতর চিৎকার করে যাচ্ছে কিন্তু তিনটে লোকের সঙ্গে, যাদের গায়ে প্রচুর শক্তি, যুঝে ওঠা অসম্ভব। ওরা তাকে শেষ পর্যন্ত হিঁচড়ে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে।

খানিকটা নিয়ে যাবার পর মেয়েটা কিভাবে যেন নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে, তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকে। কোথায়, কোন দিকে যাচ্ছে তার লক্ষ নেই। লোক তিনটেও তার পেছন পেছন ধাওয়া করে যায়।

ক'দিন আগে টিভিতে একটা জাঙ্গল পিকচার দেখেছিল শমিতা—'টুথ অ্যান্ড ক্ল'। ছবির একটি দৃশ্যে একটা দলছুট হরিণকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল একটা হিংস্র চিতা। আতঙ্কে, মৃত্যুভয়ে হরিণটা ছুটছিল, অবিকল এই মেয়েটার মতো।

এর জন্য প্রস্তুত ছিল না শমিতা। একপলক থ হয়ে থাকে সে, তারপরই বিমূঢ় ভাবটা কেটে যায়। লাউঞ্জে অন্য যে সব লোকজন এমন একটা চমকপ্রদ ঘটনায় হতচকিত হয়ে গিয়েছিল তাদের উদ্দেশে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আপনারা

বোবার মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? স্কাউন্ড্রেলগুলোকে ধরুন—ধরুন—' ভেতরকার কোনো এক তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সে নিজেই প্রথমে দৌড়ে যায়। ছুটতে ছুটতে সে লক্ষ করে সাংবাদিক সুরজিৎ সোমও তার পেছন পেছন লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটে আসছে।

গোটা লাউঞ্জটায় উত্তেজনা চারিয়ে গিয়েছিল। কেউ আর দাঁড়িয়ে নেই, ক্ষিপ্তের মতো সেই লোক তিনটেকে ধরার জন্য চারদিক থেকে ছুটে আসছে। চিৎকার করে তারা কী বলছিল, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

তিনটে লোকের একজন মেয়েটির খুব কাছে চলে এসেছিল, বাকি দু'জন খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে।

মারমুখী জনতাকে দেখে ভড়কে গিয়ে পেছনের লোক দুটো এধার-ওধারের দরজা দিয়ে পলকে উধাও হয়ে যায়। লোকজন অবশ্য তাদের পিছু ছাড়ে না। তাড়া করে লাউঞ্জের বাইরে চলে যায়।

এদিকে অন্য যে লোকটা নাছোড়বান্দার মতো মেয়েটির গায়ের সঙ্গে লেগে আছে তার আর কোনো দিকে নজর নেই। দাঁতে দাঁত চেপে সে ছুটছে, যেভাবে হোক মেয়েটাকে সে ধরবেই। লোকটা তার দুই সঙ্গীর চেয়ে অনেক বেশি বেপরোয়া। উত্তেজিত মানুষজন যে তাকে ধরার জন্য ছুটে আসছে তা নিয়ে যেন তার বিন্দুমাত্র ভয় বা দুশ্চিন্তা নেই।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে মেয়েটা আর ঐ লোকটা শমিতার কাছাকাছি আসতেই সে লোকটার বুকের কাছটা জামাসুদ্ধ সজোরে চেপে ধরে। বলে, 'রাসকেল, এই মেয়েটার পেছনে লেগেছ কেন ?'

বাধা পাওয়ায় লোকটা প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণে সামলে উঠে বলে, 'ছোড় দিজিয়ে মেমসাহেব, ছোড় দিজিয়ে—'

'তার আগে বল তুমি কে ? মতলব কী তোমার ?' শমিতার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে।

মেয়েটা থেমে গিয়েছিল, একপাশে দাঁড়িয়ে যদিও সে কাঁপছে তবু শমিতাকে এভাবে লোকটার বিরুদ্ধে রুখে উঠতে দেখে খানিকটা যেন ভরসা পেয়েছে।

লোকটা মেয়েটিকে দেখিয়ে বলে, 'কোনো বুরা মতলব নেই মেমসাহেব, আমি ওর চাচা লাগি।'

মেয়েটি এবার মুখ খোলে, 'ও আমার কেউ হয় না মেমসাহেব। ওর কথা বিশ্বেস করবেন না।'

লোকটি চিৎকার করে ওঠে, 'ঝুট। ছোড়িয়ে মুঝকো—'

'ছাড়ব! চল থানায়—' শমিতা এক হ্যাঁচকায় তাকে ডান দিকে খানিকটা এগিয়ে দেয়।

লোকটার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'আমার ওপর জুলুম করবেন না মেমসাহেব।'

মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিল শমিতার। উত্তর না দিয়ে সে লোকটাকে টানতে থাকে।

লোকটার দু'চোখে আগুন ঝলকে ওঠে, 'আমাকে ছাড়বেন কিনা বলুন। নেহী তো—'

তার বলার ধরনে এমন একটা শাসানির সুর রয়েছে যা শমিতার রক্তচাপ আচমকা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। সে বলে, 'আগে চল থানায়। তোমার বদমাইশি বার করছি।'

লোকটা ঝটকা মেরে বার বার নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল কিন্তু শমিতা এমনভাবে ধরে রেখেছে যে কিছুতেই ছাড়াতে পারছিল না। মেয়ে হলেও সে নরম লবঙ্গলতিকা মার্কা নয়, তার গায়ে যথেষ্ট জোর। সাহসও প্রচণ্ড। একসময় শখ করে কিছুদিন ক্যারাটেও শিখেছিল। লোকটা একটু এদিক ওদিক করলে মেরে তার হাড় ভেঙে দেবে।

লোকটার চেহারা এবার আগাগোড়া বদলে যায়। প্রচণ্ড আক্রোশে তার মুখ হিংস্র দেখায়। শরীরের সব রক্ত উঠে এসে দু-চোখে জমা হতে থাকে, মনে হয় সে দুটো যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়বে।

লোকটা বলে, 'আপনাকে আখরি বার হোঁশিয়ার করছি মেমসাহেব, ছেড়ে দিন—'

আরেক টানে লোকটাকে সামনের দিকে আরো কিছুটা এগিয়ে দেয় শমিতা। লোকটার মাথায় এবার খুন চড়ে যায় যেন। চকিতে পকেটে হাত পুরে কিছু একটা বার করে আনে সে, সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়েটা ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মেমসাহেব, ছুরি—ছুরি—'

শমিতাও লক্ষ করেছিল। বিদ্যুৎগতিতে তার বাঁ হাতটা তলোয়ারের

ফলার মতো লোকটার বাঁ কানের ওপর আড়াআড়িভাবে প্রচণ্ড ঘা মারে। 'আঁক' করে তার গলায় একটা আওয়াজ হয়, তারপরেই কয়েক ফুট দূরে ছিটকে পড়ে সে।

সুরজিৎ এবং আরো কয়েকজন দৌড়ে এসেছিল। শমিতা বলে, 'ধরুন ধরুন, ওকে থানায় নিয়ে যেতে হবে।'

লোকটা লাউঞ্জের মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সুরজিৎরা তার কাছে আসার আগেই স্প্রিং-লাগানো মেশিনের মতো লাফ দিয়ে উঠে পড়ে এবং বাঁ ধারের 'একসিট' গেটের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগায়। দৌড়ুতে দৌড়ুতে দূর থেকে শমিতার উদ্দেশে সে বলে, 'মেমসাহেব, আপনাকে আমি ছাড়ব না। জরুর দেখ লুঙ্গা—'

সুরজিৎরা তাড়া করেও তাকে ধরতে পারে না।

দুই

এয়ারপোর্টে তারা এতগুলো মানুষ কিন্তু তিন বদমাশের একটাকেও ধরা গেল না। শমিতা রীতিমতো হতাশই হয়ে পড়ে।

এবার তার চোখ গিয়ে পড়ে সেই মেয়েটার ওপর। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমানে কাঁপছিল। তার চোখেমুখে তীব্র আতঙ্ক, গলার ভেতর থেকে জড়ানো জড়ানো দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে আসছিল।

এদিকে সুরজিৎরা ফিরে এসেছে। শমিতা মেয়েটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'একে নিয়ে কী করা যায় বলুন তো?'

সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, 'মেয়েটি কে?'

'জানি না। এখানেই তো প্রথম দেখলাম।' শমিতা বলে যায়, 'যতটুকু বুঝতে পেরেছি, ঐ স্কাউড্রেলগুলো ওকে কোথাও পাচার করার মতলবে ছিল।'

একটু ভেবে সুরজিৎ বলে, 'ওর সম্বন্ধে ডিটেল জানা দরকার। কোথায় বাড়ি, কী নাম, ঐ লোকগুলোর খপ্পরে কী করে পড়ল—'

মেয়েটাকে বসিয়ে তার চারপাশে গোল হয়ে বসে শমিতারা। নানা প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, তার নাম পারুল, মা-বাবা নেই, উত্তর চব্বিশ পরগনার

তাতারপুরে এক দূর সম্পর্কের মামার কাছে থাকে। অনাথ ছেলেমেয়েদের অন্যের সংসারে যা হাল হয় পারুলেরও তাই হয়েছিল। নামেই মামা-মামী, পান থেকে চুন খসলে তারা তুলকালাম ঘটিয়ে দিত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মুখ বুজে খেটে যেত সে। মোটামুটি এভাবেই চলছিল, কিন্তু হঠাৎ মামার বেশ কিছু চাষের জমি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় সংসারটা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল। মামার বদ খেয়ালের তো শেষ নেই। নেশা-ভাং, মেয়েমানুষ, সমস্ত ব্যাপারেই চৌকস। এসব মাথায় চাপলে মানুষ কি আর মানুষ থাকে ? এর জন্য প্রচুর ধারদেনা হয়ে গিয়েছিল মামার, ফলে জমিগুলো গেছে। এখন সারাক্ষণই অভাব। আগে তবু দু'বেলা ভরপেট খাওয়াটা জুটত। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে বেশির ভাগ দিন উপোস দিয়েই কাটতে লাগল। এর দায় যেন পারুলের। মামাদের সব আক্রোশ এসে পড়ল তার ওপর। অত্যাচরের মাত্রাটা ক্রমাগত বাড়তেই লাগল। তবু যে সে ওখানে পড়ে ছিল সেটা নিরুপায় হয়েই, কেননা তার বয়েসের একটা মেয়ে কোথায় যাবে, কার কাছে নিরাপদ আশ্রয় পাবে ?

কিন্তু অভাব মামাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দিল। ক'দিন ধরেই ঐ লোক তিনটে যারা পারুলকে এয়ারপোর্টে নিয়ে এসেছে, মামাবাড়িতে তাদের আনাগোনা চলছিল। ওরা এ তল্লাটের লোক না, কোত্থেকে এসেছে পারুলের জানা নেই। ওদের ভাষাও সে ভাল বোঝে না। তবে মামার সঙ্গে কথাবার্তার সময় ওদের মুখে বার কয়েক দিল্লি আর হরিযানার নাম শুনেছে সে।

লোক তিনটেকে গোড়ায় ভালই মনে হয়েছিল পারুলের, বেশ হাসিখুশি আর আমুদে। যখনই আসত প্রচুর মিষ্টি বা মাছ-মাংস, ভাল ভাল আনাজ আনত। রীতিমতো ভোজের আসর বসে যেত মামাবাড়িতে। দিন কয়েক ওদের যাতায়াতের পর হঠাৎ একদিন মামা খুব মোলায়েম করে পারুলকে বলেছিল, 'সোম্‌সারের হাল তো দেকছিস, সবাই মিলে না খেয়ে মরতে বসিচি। মামার বাড়ি এসে তোর দুগ্‌গতির শেষ লেই, কত কষ্ট আর করবি !'

যে মামা মামীর সঙ্গে যৌথভাবে এতকাল তার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে তার মুখে এ জাতীর কথা শুনে হাঁ হয়ে গিয়েছিল পারুল। অবশ্য সে লক্ষ করেছে ঐ লোক তিনটে আসা-যাওয়া শুরু করার পর মামা-মামী তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত না। সব সময় হাসিমুখে কথা বলত, ওদের চোখমুখ

থেকে তার জন্য অঢেল স্নেহ যেন চুঁইয়ে পড়ত। ওরা যেন রাতারাতি বদলে গিয়েছিল।

মামা এবার বলেছে, 'গণপতিবাবুদের তোর কথা বলিচি। অনেক ধরাধরি করতি ওনারা তোর জন্যি কলকাতায় হাতের কাজ শেখার ব্যবোস্তা করেচে। ওখেনে পেট পুরে খেতে পাবি, হাতখরচাও কিছু দেবে। কাজ শেখা হয়ে গেলে ভাল মাইনে দেবে। দুঃখুকষ্ট আর থাকবে নি।' একটু ভেবে বলেছে, 'তুই আগে যা। পরে টিয়াকেও পাটিয়ে দেব।' টিয়া মামার বড় মেয়ে, পারুলের চেয়ে বছর খানেকের ছোট।

সেই প্রথম পারুল জানতে পারে ঐ লোক তিনটের নাম গণপতি, মোহনলাল আর জগদেও। অচেনা, অনাত্মীয় লোকগুলোর সঙ্গে যেতে প্রবল আপত্তি করেছিল সে। মামা ওদের সম্বন্ধে প্রচুর ভাল ভাল কথা বলেছে। ওদের যথেষ্ট দয়ামায়া। এমন মানুষ নাকি ভূ-ভারতে কমই আছে। কিন্তু পারুলের মন গোড়ায় সায় দেয় নি। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে রাজি করায় মামা।

পারুল ভেবে দেখেছে, সে রাজি না হলে পরে এই নিয়ে ভীষণ অশান্তি হবে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, পরের কাঁধে বোঝা হয়ে থাকার চাইতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা ঢের বেশি সম্মানজনক। তাছাড়া কিছুদিন পর টিয়াও তো যাচ্ছে। খারাপ কিছু হলে মামা কি নিজের মেয়েকে সেখানে পাঠাবার কথা ভাবত!

কিন্তু এসব যে মামার কত বড় চাল সেটা আজই বুঝতে পেরেছে পারুল। আজ সকালে গণপতিদের সঙ্গে তাতারপুর থেকে বাসে উঠেছিল সে। আগে দু-একবার কলকাতায় এসেছিল সে, শহরটা সম্পর্কে তার আবছা একটা ধারণা ছিল। সে বুঝতে পারছিল কলকাতায় না ঢুকে বাসটা অন্য দিকে চলেছে। শেষ পর্যন্ত গণপতিরা তাকে বাস থেকে নামিয়ে এই 'উড়োজাহাজের আপিসে' (এয়ারপোর্টে) নিয়ে আসে। পারুল ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছে, 'আমারে এখেনে লিয়ে এলেন যে!'

মোহনলাল বলেছে, 'এখানে একটু দরকার আছে।'

পারুল উৎকণ্ঠিতের মতো বলেছে, 'কী দরকার?'

এবার গণপতি সোজাসুজি বলেছে, 'আমরা এখান থেকে দিল্লি যাব।'

চমকে উঠেছিল পারুল, 'আমার তো কলকাতায় গিয়ে কাজ শেখার কথা। মামারে তাই বলেই তো নিয়ে এয়েচেন।'

গণপতিরা হেসেছিল। জগদেও বলেছে, 'কলকাতায় তো যাবেই, তার আগে দু'দিন দিল্লি ঘুরে এসো। তোমার বেড়াতে ভাল লাগে না?'

পারুল বুঝতে পারছিল, লোকগুলোর উদ্দেশ্য খুব খারাপ। ভয় পেলেও খানিকটা সাহস জড়ো করে সে চিৎকার করে উঠেছিল, 'আমি দিল্লি যাব না, যাব না, যাব না—'

'এ ছোকরি, হল্লা করবে না।'

লোকটার গলার স্বর সাপের হিস হিস আওয়াজের মতো ভয়ঙ্কর কিন্তু পারুলের ভেতর থেকে কেউ যেন ক্রমাগত বলে যাচ্ছিল সে চুপ করে গেলে মারাত্মক কিছু ঘটে যাবে। চারপাশে এত মানুষজন, না চেঁচালে তারা তার বিপদের কথা জানবে কী করে?

একটা ছোরা বার করে তার ফলাটা নিজের ঠোঁটের ওপর রেখে জগদেও চাপা গলায় এবার বলেছিল, 'চুপ। আর একটা কথাও নয়—'

পারুল তখন মরিয়া। তাকে থামানো যায়নি, তবে গলা নামিয়ে বলেছে, 'আমাকে মামার কাচে দিয়ে আসুন।'

জগদেও আবার ঠোঁটের ওপর ছুরির ফলা রেখে হিংস্র গলায় বলেছিল, 'চুপ। শুনে নাও, তোমার মামা তোমাকে আমাদের কাছে বিশ হাজার টাকায় বেচে দিয়েছে। কেনা মাল আমরাও ফেরত দেব না, সেও নেবে না। ঝঞ্ঝাট না করে যা বলি তাই করে যাও।'

কথা শেষ করে অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মতো বসে থাকে পারুল। তারপর ঝাপসা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'তারপরে তো আপনারা আমারে বাঁচালেন। শয়তানগুলোন পালাল। বলেন, এখুন আমি কী করব?' বলে দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে।

প্রশ্নটা এতই গোলমেলে যে কেউ উত্তর দেয় না।

পারুল আবার বলে, 'কুথায় যাব আমি?'

এবারও সবাই চুপ।

এদিকে চারপাশের ভিড়টা দ্রুত পাতলা হয়ে যাচ্ছিল।

শমিতা একধারে দাঁড়িয়ে পারুলের দিকে তাকিয়ে আছে। কোথায়

ল্যান্সডাউন রোডে নিজের ফ্ল্যাটটিতে ফিরে সে ক্লান্ত শরীর নিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়বে তা নয়, এয়ারপোর্টের এমন এক চমকপ্রদ ঘটনায় সে জড়িয়ে পড়ল যেমনটা দেখা যায় হলিউডের কোনো দমবন্ধ-করা অ্যাকশন-মার্কা ছবিতে। শোনা যায় এ জাতীয় ঘটনা নাকি টেক্সাসে ঘটে থাকে। পারুলকে তিন বদমাশের হাত থেকে আপাতত রক্ষা করা গেছে ঠিকই কিন্তু সে তার যা ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বলল সেটা প্রচণ্ড উদ্বেগজনক। গণপতিদের কাছে তার মামা যে তাকে বিক্রি করে দিয়েছে তাতে কোনোরকম সংশয় নেই। পারুলের পক্ষে মামাবাড়িতে ফিরে যাওয়া এখন সম্ভব নয়।

পারুলকে উদ্ধার করার পরও সমস্যা মিটছে না। এই অবস্থায় তাকে ফেলে যেতেও পারছে না শমিতা। যার মধ্যে বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ববোধ রয়েছে তার পক্ষে সেটা সম্ভবও নয়। মেয়েটার প্রতি এক ধরনের নৈতিক দায়িত্ব যেন এসে পড়েছে তার।

সুরজিৎ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে শমিতা বলে, 'দারুণ প্রবলেম হয়ে গেল তো।'

সুরজিৎও পারুলের কথা ভাবছিল। সমস্ত ব্যাপারটা যে অত্যন্ত জটিল সেটা তার কাছেও খুব পরিষ্কার। আস্তে মাথা নেড়ে সে বলে, 'হুঁ—'

'পারুলকে ওর মামাবাড়িতে পাঠানো যাবে না।'

'মোস্ট সার্টেনলি নট। ওর মামা একটা আস্ত সোয়াইন। সেখানে ফিরলে পারুলের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'ওখানে পারুল সেফও নয়। ঐ হারামজাদাগুলো আবার হানা দিয়ে ওকে নিয়ে যাবে। মামা রেজিস্ট তো করবেই না, বরং সবরকমভাবে কো-অপারেট করবে।'

এদিকটা ভেবে দেখেনি শমিতা, তার টেনশান হঠাৎ বেড়ে যায়। বলে, 'তা হলে?

'তা হলে কী?'

'মেয়েটার শেলটারই শুধু নয়, তার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা দরকার। কী করা যায় বলুন তো?'

সুরজিৎ বলে, 'আমরা আর কী করতে পারি? ওর পেছনে একটা

ক্রিমিনাল গ্যাং লেগেছে। তারা সহজে ছেড়ে দেবে না। আমার মনে হয় ওকে এখনই থানায় নিয়ে যাওয়া দরকার। পুলিশ প্রোটেকশনে থাকলে মেয়েটা বেঁচে যাবে।'

শমিতা সায় দেয়, 'ঠিকই বলেছেন। যা ব্যাপার ঘটে গেল, পুলিশকে ইমিডিয়েটলি জানানো দরকার। এয়ারপোর্টে নিশ্চয়ই ফাঁড়ি-টাঁড়ি আছে ?'

'আছে।'

'আমার সঙ্গে কাইন্ডলি একটু যাবেন ?'

'নিশ্চয়ই।'

ভিড় হালকা হয়ে গেলেও এখনও যে দু-চারজন রয়েছে সুরজিৎ তাদের উদ্দেশে বলে, 'আপনারাও চলুন। বদমাশগুলো যদি ধরা পড়ে আর কোর্টে কেস ওঠে আপনাদের উইটনেস হিসেবে দরকার হবে।'

পুলিশ আর আদালতের নাম শুনে অবশিষ্ট ক'জনও আর দাঁড়ায় না, দ্রুত সরে পড়তে থাকে। পুলিশের কথায় ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছে পারুল। এতক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদছিল, হঠাৎ তার কান্নাটা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে ভাঙা, জড়ানো গলায় বলতে থাকে, 'আমি পুলিশের কাচে যাব না। আমারে থানায় লিয়ে যাবেন না মেমসাহেব।'

বিমূঢ়ের মতো শমিতা জিজ্ঞেস করে, 'পুলিশের কাছে না গেলে তুমি থাকবে কোথায় ?'

উত্তর না দিয়ে সমানে মাথা ঝাঁকিয়ে যায় পারুল। তার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বোঝাতে থাকে শমিতা। পুলিশের কাছেই যে সে সবচেয়ে নিরাপদে থাকতে পারবে, সেটাই হবে তার একমাত্র আশ্রয়—বার বার এসব বলেও পারুলের কান্না থামানো যায় না।

সুরজিৎও নানাভাবে বোঝায় পারুলকে কিন্তু কোনো কাজই হয় না। সে অনড়, থানায় কিছুতেই যাবে না।

বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো সুরজিতের দিকে তাকায় শমিতা। একটা বিপন্ন গেঁয়ো মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে এমন ঝামেলায় পড়তে হবে, কে ভাবতে পেরেছিল। একবার সে ভাবে, পারুলের জন্য যেটুকু করার তার চেয়ে অনেক বেশিই করেছে সে। থানায় যখন মেয়েটা যেতে চাইছে না তখন তার আর কী করণীয় থাকতে পারে ? এই লাউঞ্জে বসে থাক সে, যা ইচ্ছা করুক। শমিতা আর

এক মুহূর্তও এখানে থাকছে না, সোজা নিজের ফ্ল্যাটে চলে যাবে। ভাবল বটে, কিন্তু তার দায়িত্ববোধ কিছুতেই এখান থেকে তাকে এক পাও নড়তে দিল না। ফলে নিজের ওপরেই প্রচণ্ড রেগে যাচ্ছিল সে, মনের ভেতর বিরক্তি জমা হচ্ছিল।

পৃথিবীতে কত মানুষের কত সমস্যা। সে সব ব্যাপারে মাথা গলাতে গেলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। এয়ারপোর্টে যত কমই হোক, কিছু লোকজন তো ছিল। তারা কেউ এগিয়ে আসার আগে কেন যে পারুলকে বাঁচাতে সবার আগে সে ছুটে গিয়েছিল তার কোনো সদুত্তর নিজের কাছেই নেই শমিতার। হঠাৎ মনে মনে হেসে ফেলে সে। এটাই তার চিরদিনের স্বভাব কিংবা নিজস্ব ইনস্টিংক্ট। কাউকে বিপন্ন দেখলে সবার আগে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর শমিতা সুরজিৎকে বলে, 'আমার হোল লাইফে এমন প্রবলেমে আর পড়িনি। কী করব একটা পরামর্শ দিন।'

সুরজিৎ বলে, 'দেখুন, যা ঘটে গেল তাতে থানায় ওকে নিয়ে যেতেই হবে। ঘটনার একটা রেকর্ড পুলিশের কাছে রাখা দরকার।'

'তা তো বুঝতে পারছি কিন্তু মেয়েটা যে গোঁ ধরেছে থানায় যাবে না।'

'দেখি আরেক বার বলে-কয়ে।'

'দেখুন।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সুরজিৎ পারুলের পাশে গিয়ে বসে। খুব নরম গলায় ডাকে, 'পারুল—'

পারুল অঝোরে কেঁদে যাচ্ছিল। কান্নার দমকে তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। আবছা গলায় সে বলে, 'কী কইচেন?'

'থানায় থাকো বা না থাকো, তোমাকে একবার সেখানে যেতেই হবে।'

'কেন?'

'সেটাই নিয়ম।'

'আমি তো কুনো দোষ করিনি। করেচে ঐ বজ্জাতগুলোন। তবু আমারে থানায় যেতি হবে?'

'হ্যাঁ। ওদের সব কথা তোমাকে জানাতে হবে পুলিশকে। ভেবে দেখ, লোকগুলো যদি ধরা না পড়ে তোমাকে আবার বিপদে ফেলতে পারে। পুলিশ ছাড়া কে ধরবে ওদের?'

গণপতিরা যে ফের ঝঞ্ঝাট বাধাতে পারে, সেটা আগে মাথায় আসেনি পারুলের। নিজের অজান্তেই তার কান্না থেমে যায়। কী একটু চিন্তা করে, তারপর নিরুপায় ভঙ্গিতে বলে, 'ঠিক আছে, চলেন। কিন্তুন—'

সুরজিৎ জানতে চায়, 'কিন্তু কী ?'

পারুল বলে, 'আমি ওখেনে থাকব না। কিচুতেই লয়।'

সুরজিৎ ভেতরে ভেতরে থমকে যায়। সে ছক কযেছিল, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পারুলকে একবার থানায় নিয়ে যেতে পারলে পুলিশের হাতে তুলে দেওযা যাবে। তারপর সে আর শমিতা এই উটকো সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে যে যার বাড়ি ফিবতে পারবে। কিন্তু মেয়েটা বোধহয় মুখ দেখে তার মনের কথা আঁচ করে নিয়েছিল। সুরজিৎ প্রথমটা বিব্রত বোধ করে, পরক্ষণে সামলে নিয়ে বলে, 'আগে তো থানায় চল—'

পারুল এবার আর কিছু বলে না। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে।

থানায এসে সুরাহা কিছুই হয না। সুরজিতেব ছকটা পুরোপুরি উল্টে দেয পারুল। গণপতিদের ব্যাপারে পুলিশ অফিসারের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব সে দিল ঠিকই কিন্তু যখন তাকে পুলিশের হেফাজতে থাকার কথা বলা হলো, নতুন করে ফের কান্না শুরু করল।

পুলিশ অফিসারটিকে তরুণ বলা যায। নাম প্রণবেশ সান্যাল। বেশ সহৃদয় এবং সহানুভূতিশীল। বার বার তিনি বোঝালেন, পুলিশের আশ্রয়ে সে ভাল থাকবে, নিরাপদে থাকবে, কেউ তার এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কিছুই কানে তুলল না পারুল। তার এক কথা, এখানে থাকবে না।

কাঁদতে কাঁদতে পারুলের যখন হিক্কা ওঠার উপক্রম, চিন্তিতভাবে প্রণবেশ শমিতাদের জিজ্ঞেস করেন, 'একে নিয়ে কী করা যায় বলুন তো ?'

শমিতা অসহায় ভঙ্গিতে একটু হাসে, 'কি জানি, বুঝতে পারছি না। আপনি কিছু একটা ব্যবস্থা করুন।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন প্রণবেশ। তারপর পারুলকে জিজ্ঞেস করেন, 'এখানে তো থাকতে চাইছ না। তবে কি তোমাকে তোমার মামার কাছে পাঠিয়ে

দেব ?'

'না—' জোরে জোরে মাথা নাড়তে থাকে পারুল, সেই সঙ্গে একটানা কান্না চলছেই।

'কলকাতায় তোমার কোনো আত্মীয়-স্বজন আছে ?'

'না।'

প্রণবেশ বলেন, 'বিপদে ফেলে দিলে দেখছি।'

পারুল উত্তর দেয় না।

প্রণবেশ এবার জানতে চান, 'কোথায় যেতে চাও তুমি ?'

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসে পারুল। শমিতার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে দু'হাতে তার হাঁটু দুটো আঁকড়ে ধরে, তারপর মুখটা ওর পায়ের পাতায় ঘষতে ঘষতে ব্যাকুলভাবে বলতে থাকে, 'আমি মেমসাহেবের সন্‌গে যাব। আপনি আমারে লিয়া চলেন—'

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে যায় শমিতা। তারপর নিজেকে মুক্ত করার জন্য চেঁচিয়ে ওঠে, 'ছাড়ো পারুল, ছাড়ো—' কিন্তু যেভাবে মেয়েটা তাকে আঁকড়ে ধরেছে, কিছুতেই ছাড়ানো যায় না।

প্রণবেশ বলেন, 'মেয়েটা আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ওর যা মানসিক অবস্থা, এখন অন্য কোথাও ওকে রাখা ঠিক হবে না।'

শমিতা বলে, 'তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু—'

প্রণবেশ বলেন, 'এক কাজ করুন ম্যাডাম—'

'কী ?'

'আজ ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। কয়েকটা দিন আপনার কাছে রাখুন। আপনার কার্ড তো আমার কাছে রইলই, রোজ একবার পারুলের খোঁজ নেব। তবু যদি হঠাৎ কোনো প্রবলেম দেখা দেয় আমাকে ফোন করবেন।'

থানায় এসে প্রথমেই নিজের পরিচয় এবং নাম-ঠিকানা দেওয়া ছাপা একটা কার্ড প্রণবেশকে দিয়েছিল শমিতা। তাঁর পরামর্শে সে একেবারে হকচকিয়ে যায়, কী বলবে ভেবে পায় না।

এদিকে সুরজিৎ মাথা নেড়ে প্রণবেশের কথায় সায় দেয়, 'গুড সাজেশান। আপাতত এর চেয়ে বেটার অ্যারেঞ্জমেণ্ট আর কিছু হয় না। পারুলকে আপনি

নিজের কাছেই নিয়ে যান।'

শমিতা বলে; 'কিন্তু আমি তো একা—' কথাটা শেষ না করে আচমকা থেমে যায় সে। পারুলের দিকে একবার তাকায়, বিপন্ন মেয়েটার জন্য কষ্ট এবং সহানুভূতিতে তার মন ভরে যায়। পারুলকে তার কাছে নিয়ে যাবার পর ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে, এই মুহূর্তে তা আর ভাবে না শমিতা। আস্তে আস্তে অনেকটা ঝুঁকে দু'কাঁধ ধরে তাকে তুলতে তুলতে ভারি গলায় বলে, 'কেঁদো না, ওঠ। থানায় থাকতে হবে না, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

পারুলের সারা মুখ চোখের জলে মাখামাখি হয়ে আছে। তার মধ্যেই ফ্যাকাসে একটু হাসি ফোটে। সে হাসিতে কৃতজ্ঞতা, স্বস্তি, ভয় আর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির আরাম।

প্রণবেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শমিতা, পারুল আর সুরজিৎ এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের বাইরে কার পার্কিং জোনের কাছে চলে আসে। সুরজিৎ এখন শহরে ফিরবে কিনা জিজ্ঞেস করায় সে জানালো আপাতত ঘণ্টা দেড় দুই তাকে এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে হবে। দিল্লি থেকে এক বন্ধুর আসার কথা আছে। সে এলে তাকে নিয়ে ফিরবে। তারপর বলে, 'মেয়েটাকে শেলটার দিচ্ছেন, এমন সোসাল রেসপনসিবিলিটি আজকাল কেউ নিতে চায় না। দিস ইজ সামথিং গ্রেট—'

শমিতা চমকে ওঠে। সুরজিৎ কি ধরেই নিয়েছে সে চিরকালের মতো পারুলকে আশ্রয় দিতে চলেছে! শশব্যস্তে বলে, 'এটা একেবারেই টেম্পোরারি ব্যাপার। মেয়েটা কাঁদছিল আর আপনারা এত করে বললেন, তাই—'

সুরজিৎ বুঝতে পারছিল এরকম উটকো, অবাঞ্ছিত দায় কেউ স্থায়ীভাবে বয়ে বেড়াতে চায় না। সাময়িকভাবে হলেও শমিতা পারুলকে যে নিজের কাছে থাকতে দিতে রাজি হয়েছে সেটাই যথেষ্ট। সে বলে, 'আপাতত ক'দিন আপনার কাছে মেয়েটা থাক, তারপর ভেবেচিন্তে ওর একটা ব্যবস্থা করে দিলেই চলবে।'

হঠাৎ শমিতার মাথায় রাগ চড়ে যায়। অন্যের কাঁধে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে লোকে হাততালি দেয়, ভাল ভাল কথা বলে, কিন্তু সবটাই নিজের নিজের গা বাঁচিয়ে। যত আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরের দল। কিন্তু কী ব্যবস্থা সে করবে পারুলের জন্য? যে মেয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড ঐরকম তার জন্য

কী-ই বা করা যেতে পারে ?

শমিতা প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই সুরজিৎ আবার যা বলে, তাতে রাগটা অনেকখানি পড়ে যায়, 'আপনার কাঁধে একটা বড় রকমের দায় চেপে যাচ্ছে বুঝতে পারছি। যদি পাবুলের ব্যাপারে আমাব কোনো সাহায্য দরকার হয় বলবেন—'

অর্থাৎ দায়িত্বটা পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে চাইছে না সুরজিৎ। শমিতার খেয়াল হয়, এয়ারপোর্টে এত তো লোকজন ছিল কিন্তু সুরজিৎ ছাড়া আর কেউ তার সঙ্গে থানায় যায়নি। প্রথম থেকে সুরজিৎ ওভাবে এগিয়ে না এলে খুবই অসুবিধায় পড়ে যেত শমিতা। সুরজিৎ পাশে থাকায় তার মনের জোর যে অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল তা সে নিজেও বোঝে।

শমিতা বলে, 'মনে হচ্ছে আপনার হেল্প দরকার হবে।'

সুরজিৎ জিজ্ঞেস করে, 'আমার অফিসের ফোন নাম্বার কি জানেন ?'

'না। তবে আপনাদের কাগজের কমপ্লিমেণ্টারি কপি আমাদের অফিসে রেগুলার আসে। সেখান থেকে দেখে নিতে পারি।'

'বিকেল থেকে আমাকে অফিসে পাবেন—রিপোর্টিং সেকশনে।'

'ঠিক আছে।'

'তেমন জরুরি মনে করলে আমাদের বাড়িতেও সকালের দিকে ফোন করতে পারেন। বারটা পর্যন্ত বাড়িতে থাকি। সঙ্গে আমার কার্ড নেই। অফিসে আমাকে না পেলে অপারেটরকে আমার বাড়ির ফোন নাম্বার আর ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে।'

'আচ্ছা।'

সুরজিৎ আর দাঁড়ায় না, এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের দিকে চলে যায়। আর শমিতা পার্কিং জোনে তাদের গাড়িটার খোঁজ করতে থাকে কিন্তু গাড়ি বা ড্রাইভার কাউকেই পাওয়া যায় না। হয়তো এ-বেলা আর আসেনি রামেশ্বর কিংবা এলেও তাকে না পেয়ে চলে গেছে।

অগত্যা ট্যাক্সিই নিতে হলো।

তিন

ল্যান্সডাউন রোডের একটা হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের সামনে এসে ট্যাক্সিটা যখন থামল, শমিতার রিস্টওয়াচে আটটা বেজে তেত্রিশ।

ট্যাক্সি থামতেই গেটের দারোয়ান দৌড়ে এসেছিল। শমিতা তাকে ক্যারিয়ার থেকে সুটকেস বার করতে বলে ভাড়া মিটিয়ে পারুলকে নিয়ে নেমে পড়ে। গেটের ভেতর পা বাড়াতে গিয়ে কী ভেবে একবার পেছন ফেরে সে, দেখতে পায় উল্টো দিকের ফুটপাতের কাছে একটা হলুদ রঙের ট্যাক্সি থামতে না থামতেই আচমকা প্রচণ্ড স্পিড তুলে দক্ষিণ দিকে উধাও হয়ে গেল। সেটার জানলায় সেই নিরেট চেহারাব লোকটার মুখ, যার নাম গণপতি এবং যার বুকের কাছটা কিছুক্ষণ আগে সে চেপে ধরেছিল— চকিতের জন্য একবার চোখে পড়ে।

লোকটা কি এয়ারপোর্টের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের ধারেকাছে কোথাও ওত পেতে বসে ছিল ? তাদের ট্যাক্সিতে উঠতে দেখে ওরাও একটা ট্যাক্সি ধরে পিছু নিয়েছে ? শমিতা সাহসী মেয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে তার শিরদাঁড়ায় শিহরন খেলে যায়। মনে হয়, ওরা পারুলকে সহজে ছাড়বে না। অর্থাৎ তার জন্য শমিতাকেও বিপন্ন হতে হবে। কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় এই অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস পর্যন্ত টেনে এনে মেয়েটাকে বলা যায় না আমি যতটুকু পেরেছি করেছি, এবার তোমার রাস্তা দেখে নাও।

শমিতা আর দাঁড়ায় না, মুখ ফিরিয়ে পারুলকে সঙ্গে করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

এগার-তলা এই হাই-রাইজটার নাম 'আটলাণ্টা'। তার একতলা জুড়ে কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। একধারে দুটো লিফট। দারোয়ান লিফটের কাছে শমিতার সুটকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শমিতারা আসতেই একটা লিফটে সুটকেসটা ঢুকিয়ে দেয়। শমিতারা ভেতরে গেলে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে গেটের দিকে চলে যায়।

শমিতা চার নম্বর সুইচটা টিপতেই লিফট ঝিঁঝির ডাকের মতো আওয়াজ

করে ওপরে উঠতে থাকে।

এক মিনিটও লাগে না, লিফট থামতেই দু'জনে বাইরের প্যাসেজে বেরিয়ে আসে। বাঁ ধারের দ্বিতীয় স্যুইটটা শমিতার। ব্যাগ থেকে চাবির গোছা বার করে দরজার তালা খুলে শমিতা পারুলকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

তিন কামরার স্যুইটটা নানা ধরনের ফ্যাশনেবল খাট, সোফা, ডিভান, ওয়ার্ডরোব ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। ড্রইংরুমের ফ্লোর জুড়ে কাশ্মীরি কার্পেট, একধারে রঙিন টিভি। দেওয়ালে দেওয়ালে নাম-করা শিল্পীদের চমৎকার কিছু পেন্টিংয়ের প্রিণ্ট বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। এছাড়া আছে আগাগোড়া টাইলসে মোড়া বড় দুটো বাথরুম যার একধারে ধবধবে বাথ-টাব, দেওয়ালের আধাআধি জুড়ে আয়না, সুদৃশ্য সব তাকে পেস্ট, ব্রাশ, চিরুনি, শ্যাম্পুর বোতল, হেয়ার টনিক লোশনের নানা আকারের সব শিশি। চারদিকে রকমারি শৌখিন জিনিস। ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তি থেকে পুরনো শ্যান্ডেলিয়ার, বাঁশ কাচ এবং পোর্সিলিনের নানা শিল্পকলার নমুনা। বেডরুম আর হল ছাড়া কিচেন, স্টোর তো আছেই।

শমিতা লক্ষ করল, ঘরগুলো ধুলোবালি, কাগজের কুচি আর গাছের পাতায় নোংরা হয়ে রয়েছে। শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, জিনসের ট্রাউজার, ব্যাগি শার্ট, উড়ুনি এধারে ওধারে দলা পাকানো। ধামসানো বালিশগুলো বিছানায় নেই, সব মেঝেতে লুটোচ্ছে। বেড-কভারের বেশির ভাগটাই নিচে ঝুলছে। যেদিকেই তাকানো যাক, সমস্ত কিছু এলোমেলা, লণ্ডভণ্ড, বিপর্যস্ত। অনেকটা শমিতার জীবনের মতোই।

স্যুইটের বেডরুমগুলো রাস্তার দিকে। শমিতার চোখ সেদিকে চলে যায়। মনে পড়ল, বম্বেতে যাবার সময় তাড়াহুড়োয় জানালা-টানালা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। এই ক'দিন হাওয়ায় হাওয়ায় ধুলোবালি ওগুলো দিয়ে ঢুকেছে। তবে বিছানা বা জামাকাপড়ের ঐ হালের জন্য সে-ই পুরোপুরি দায়ী। ক'দিন ধরে কাজের লোক আসছিল না, নিজে যে একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে যাবে, তেমন ইচ্ছাই হয়নি। ভাবটা এরকম, জীবন যার অগোছালো হয়ে গেছে তার অত ফিটফাট থাকার দরকার কী। কাজের লোক যা করে দিয়ে যায় শমিতার কাছে তাই যথেষ্ট। এর বেশ সে কিছু ভাবে না, কিন্তু এসব কথা পরে।

সুটকেসটা ড্রইংরুমের একধারে নামিয়ে একটা সোফায় শরীর এলিয়ে দেয় শমিতা। ক'দিনের অসীম পরিশ্রম আর ছোটাছুটির পর দমদমে নেমে শ্বাসরোধী এক নাটকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল সে। প্রবল উত্তেজনায় তখন অন্য কোনো দিকে তার নজর ছিল না। এখন সেই পুরনো ক্লান্তিটা আবার ফিরে এসেছে। শরীরের সব শিরাস্নায়ু যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। রাতে কিছু খাওয়ার ইচ্ছা নেই, গরম জলে স্নানটি করে এখন শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে। পরক্ষণে খেয়াল হলো পারুল তার সঙ্গে এসেছে। সে নিজে না খেলেও ঐ মেয়েটাকে সারারাত উপোস করিয়ে রাখা যায় না।

পারুল একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। এই প্রকাণ্ড বাড়ি, এত সুন্দর সাজানো স্যুইট, চারপাশের ঝলমলে আলো— সব একাকার হয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার গেঁয়ো মেয়েটিকে একেবারে স্বপ্নাবিষ্ট করে ফেলেছে। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে সে ড্রইংরুমের টিভি সোফা-টোফা দেখছিল। শমিতা তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বসো—'

পারুল একটু চমকে উঠে কার্পেটের ওপর জড়সড় হয়ে বসে পড়ে।

'ওখানে কেন, ওপরে উঠে বসো—' শমিতা একটা সোফা দেখিয়ে দেয়।

সোফাটার কোণে সন্তর্পণে উঠে বসে পারুল।

শমিতা নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, 'খুব খিদে পেয়েছে, না ?'

পারুল মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

শমিতা বুঝতে পারছিল খিদে পেলেও তা বলতে ভয় পাচ্ছে পারুল।

শমিতা বলে, 'ওবেলা কখন খেয়েছিলে ?'

পারুল কুণ্ঠিতভাবে যা জানায় তা হলো; সকালে তাতারপুর থেকে বেরুবার আগে মামাবাড়িতে ভাত খেয়েছিল। দুপুরে বাসে করে কলকাতায় আসার সময় রাস্তায় গণপতিরা চা আর ঘুগনি খাইয়েছিল। এ ছাড়া পেটে আর কিছু পড়েনি।

শমিতা এই প্রথম লক্ষ করে, পরনের সস্তা প্রিণ্টেড শাড়ি এবং খেলো ছিটের একটা জামা ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নেই পারুলের। সে জিজ্ঞেস করে, 'বাড়তি কাপড় জামা আনোনি দেখছি।'

পারুল জানালো একটা টিনের সুটকেসে দুটো শাড়ি আর জামাটামা এনেছিল, কিন্তু এয়ারপোর্টে যা সব কাণ্ড হলো তাতে সুটকেসটা সেখানেই

পড়ে আছে। আনার কথা মনে পড়েনি।

শমিতা বলে, 'ঠিক আছে, আমার একটা শাড়ি আর জামা তোমাকে দিচ্ছি। জামাটা অবশ্য গায়ে বড় হবে। আজকের মতো চালিয়ে নাও। কাল অন্য ব্যবস্থা করব।' একটু থেমে বলে, 'খানিকক্ষণ জিরিয়ে নাও। আমি ততক্ষণ স্নানটা সেরে ফেলি। তারপর দেখি পাঁউরুটি-টুটি কী আছে। আজ আর কিন্তু ভাত-টাত করতে পারব না।'

পারুল চুপ করে থাকে।

শমিতা বলে, 'পাঁউরুটি খেয়ে থাকতে পারবে তো?'

এবার ঘাড় হেলিয়ে দেয় পারুল। শমিতার সব কথায় তার নিঃশর্ত সায়।

শমিতা উঠে পড়ে। ওয়ার্ডরোব থেকে রাতে নিজে পরার জন্য হাউসকোট আর পারুলের জন্য শাড়ি-ব্লাউজ বার করে আনে। শাড়ি-টাড়ি পারুলকে দিয়ে সে সোজা চলে যায় বাথরুমে।

স্নানের ব্যাপারে দারুণ শৌখিন শমিতা। অন্য সব বিষয়ে সে ভীষণ চটপটে, যে কোনো কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চুকিয়ে ফেলে। কিন্তু স্নানটা করে ধীরেসুস্থে, অনেকটা সময় নিয়ে। বাথটাবে আধ ঘণ্টা সারা শরীর ডুবিয়ে না রাখলে তার তৃপ্তি হয় না।

প্রায় চল্লিশ মিনিট বাদে যখন শমিতা বাথরুমের দরজা খুলল, নিজেকে বেশ টাটকা লাগছে। শরীরে যে ক্লান্তি জমা হয়ে ছিল তার অনেকটাই কেটে গেছে। কিন্তু বাইরে এসে সে একেবারে অবাক হয়ে যায়। ঘরে ধুলোবালি বা শুকনো পাতা-টাতার চিহ্নমাত্র নেই। যে-সব ময়লা জামাকাপড় এধারে ওধারে ছত্রখান হয়ে পড়ে ছিল সেগুলো একটা বড় পোঁটলা করে বেঁধে রাখা হয়েছে। ধামসানো বিছানার হালও পালটে গেছে, সেগুলোর ওপর টান টান করে বেডশীট পেতে বালিশগুলো জায়গামতো সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেদিকেই তাকানো যাক, সব ফিটফাট, পরিচ্ছন্ন। আশ্চর্য এক ম্যাজিকে ফ্ল্যাটটা একেবারে বদলে গেছে।

দেখা গেল, ড্রইংরুমে একধারে পরনের শাড়িটা গাছকোমর করে বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পারুল, হাতে একটা ঝাড়ু, সারা গায়ে ধুলোর পুরু স্তর। স্যুইটের ভোল কে পালটে দিয়েছে সেটা না বলে দিলেও চলে।

শমিতার সঙ্গে চোখাচোখি হতে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে একটু হাসে পারুল।

ভয়ে ভয়ে বলে, 'ঘরগুলোন বড় লোংরা হয়েছিল। তাই—'

শমিতা বুঝতে পারছিল, সে পারুলকে এয়ারপোর্ট থেকে বাঁচিয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছে, সেই কারণে মেয়েটা প্রতিদানে কিছু একটা করতে চায়। ঘর গোছগাছ করে দেওয়াটা তার কতজ্ঞতার প্রকাশ।

ল্যান্সডাউনের এই ফ্ল্যাটে সাত-আট বছর রয়েছে শমিতা। তার একটা কাজের মেয়েও আছে—মায়া। সে আসে এক বেলা, সেই সকালের দিকে। শমিতা যতক্ষণ স্যুইটে থাকে তার ভেতর হুটপাট করে দায়সারা গোছের এটা ওটা করে দিয়ে যায়। দুর্দান্ত ফাঁকিবাজ। ছুটি ছাড়া সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে ন'টার ভেতর অফিসে বেরিয়ে যায় শমিতা। লাঞ্চ এবং বেশির ভাগ সময় ডিনারও বাইরে খেয়ে আসে। সকালে সে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ারও ছুটি। তা ছাড়া মাসের পনের দিনই অফিসের কাজে তাকে দিল্লি মাদ্রাজ হায়দ্রাবাদ করে বেড়াতে হয়। তখন মায়ার আসার প্রশ্নই নেই। অথচ মাসের শেষে পুরো টাকাটা ঠিক গুনে নিয়ে যায়।

মায়া কী করে না করে সেদিকে লক্ষই নেই শমিতার। বছর সাতেক আগে অরূপের সঙ্গে ডিভোর্স হবার পর থেকে জীবনের অনেক ব্যাপারে সে উদাসীন হয়ে গেছে। বিশেষ করে ঘর-সংসার নিয়ে সে কিছু ভাবে না। রাতে এবং সকালের দিকে কয়েক ঘন্টা বাদে এই ফ্ল্যাটের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। কলকাতায় থাকলে তবু একবার এখানে আসতে হয়। অফিসের কাজে বাইরে গেলে সেটুকুও নয়। ফ্ল্যাটটা তার কাছে রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমের মতো। কিন্তু এসব কথা পরে।

বহুদিন বাদে একটা বিপন্ন গেঁয়ো মেয়ে, যার হাত থেকে ঘণ্টাখানেক আগেও শমিতা পরিত্রাণের কথা ভেবেছে, তার ঘরগুলোকে এত যত্ন করে গুছিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ পারুলের প্রতি গভীর আবেগে তার মন ভরে যায়। স্নিগ্ধ গলায় সে বলে, 'খুব খাটলে তো?'

পারুল বলে, 'কী আর খাটনি! মামার বাড়িতে এর থিকে কত ভারি ভারি কাজ করতে হতো।'

'যাও, ঝাড়ু রেখে ঐ বাথরুমটায় যাও।' শমিতা পারুলকে সঙ্গে করে ডান পাশের অন্য একটা বাথরুমে নিয়ে কিভাবে কল খুলে বন্ধ করবে, কোথায় সাবান-টাবান আছে, সব দেখিয়ে নিজের শোওয়ার ঘরে চলে যায়। ড্রেসিং

টেবলের সামনে বসে চুলে হালকা চিরুনি চালিয়ে গায়ে পাউডার ঢেলে সে চলে আসে কিচেনে।

এই স্যুইটে রান্নাবান্নাটা ক্বচিৎ হয়ে থাকে। ছুটির দিনে ইচ্ছা হলে শমিতা কিছু একটা করে নিল, নইলে দারোয়ানকে দিয়ে কাছাকাছি কোনো রেস্তোরাঁ থেকে খাবার আনিয়ে নেয়। বন্ধুবান্ধবরা মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে এলে চাইনিজ বা মোগলাই খানার প্যাকেট নিয়ে আসে। আসলে নিয়মিত কোনো ব্যাপার নেই এখানে, সবই চলছে জোড়াতালি দিয়ে, সম্পূর্ণ এলোমেলোভাবে।

রান্না না হলেও রান্নার যাবতীয় জিনিস এখানে মজুদ থাকে। চাল ডাল আটা ময়দা মাছ মাংস ডিম আনাজ, কী নেই। ছুটির দিনে প্রায়ই বাজারে গিয়ে কিনে এনে সাজিয়ে রাখে শমিতা।

প্রথমে সে ভেবেছিল, পারুলকে পাঁউরুটি খেতে দেবে। পরে ভেবেছে দারোয়ানকে রেস্তোরাঁয় পাঠাবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে পাঁউরুটি বা রেস্তোরাঁর খাবার-দাবার খাওয়ার অভ্যাস নিশ্চয়ই নেই পারুলের। তার চেয়ে ঘরে কী আছে সেটা দেখা যাক।

বম্বে যাবার আগে সাড়ে চারশো গ্রামের দু প্যাকেট স্লাইসড ব্রেড কিনে রেখে গিয়েছিল শমিতা। দেখা গেল, ফাঙ্গাস পড়ে সেগুলো খাওয়ার অযোগ্য হয়ে উঠেছে। পাঁউরুটির চিন্তাটা আগেই নাকচ করা হয়েছিল। ও দুটো ফেলে দিতে হবে। তবে ফ্রিজে মাখন, ডিম, মাছ-টাছ রয়েছে, আর আছে এক বাক্স সন্দেশ। ওগুলো ভালই আছে। একটু ভেবে সে ঠিক করে ফেলে মাছ-টাছ আর করবে না, স্রেফ ভাতে-ভাত। চালের সঙ্গে ডিম আলু হাঁড়িতে ফেলে ফুটিয়ে নেবে। একটা রাত কোনোরকমে চলে যাবে। গাঁয়ের মেয়ের পক্ষে ভাতটাই নিশ্চয় সবচেয়ে পছন্দের।

শমিতা যখন প্লাস্টিকের একটা বড় বাস্কেট থেকে চাল বার করছে সেই সময় পারুল কিচেনের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

পায়ের আওয়াজে মুখ ফিরিয়ে তাকায় শমিতা এবং পারুলকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। স্নান করার পর যে কোনো সদ্য তরুণীর চেহারায় বাড়তি লাবণ্য এসে যায়। পারুলের চোখেমুখে অপার্থিব কোনো পবিত্রতা যেন ফুটে বেরিয়েছে। যদিও শমিতার জামাটা তার গায়ে কিছুটা ঢল ঢল করছে তবু আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল পারুলকে। গণপতিরা যদি মেয়েটাকে কোনোক্রমে

প্লেনে তুলে নিয়ে যেতে পারত তার ফলাফল কী মারাত্মক হতো, ভাবতেও ভেতরে ভেতরে চমকে ওঠে সে।

কয়েক পলক পারুলের দিকে তাকিয়ে থাকার পর শমিতা ডাকে, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এস।'

শমিতা কিসের তোড়জোড় করছে, এক নজর দেখেই আন্দাজ করে নিয়েছিল। কিচেনে ঢুকে বলে, 'ভাত বসাবেন বুঝিন ?'

'হ্যাঁ।'

'আমারে দ্যান, চাল ধুয়ে দিই।'

শমিতা বলে, 'তুমি এখানে এসে কত কাজ তো করলে, এখন আর কিছু করতে হবে না।'

পারুল বসে না, বলে, 'আমি হাত-পা গুটোয়ে বসে থাকতে পারি না। দ্যান না, দ্যান—'

পারুলের বলার ভঙ্গিতে এমন এক আন্তরিকতা রয়েছে যা শমিতাকে বেশ নাড়া দেয়। নানাভাবেই মেয়েটা প্রতিদান দিতে চাইছে। কী ভেবে শমিতা চাল মেপে ডেকচিতে ঢেলে পারুলকে দেয়, সেই সঙ্গে ক'টা আলু আর ডিমও।

চাল-টাল ধুয়ে শমিতার কাছে নিয়ে আসে পারুল। বলে, 'রান্নার উনান কই ?'

গ্যাস-ওভেন দেখিয়ে শমিতা বলে, 'এই তো উনুন।' বলে দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে ডেকচিটা তার ওপর বসিয়ে দেয়।

কিচেন দেখে আগেই তাক লেগে গিয়েছিল পারুলের। গ্যাস-ওভেন দেখে একেবারে হাঁ হয়ে যায়। এমন রান্নাঘর এবং উনুন আগে কখনও দেখেনি সে। শিশুর কৌতূহল নিয়ে গ্যাস-ওভেনটা সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নেয়। কিভাবে ওটা জ্বালাতে হয়, কেমন করে সিলিন্ডার থেকে গ্যাস উনুনে আসে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মাত্র ঘণ্টা তিনেক আগে তাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যে ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটে গেছে এবং বিপদ থেকে সে এখনও যে মুক্ত নয়, সেটা যেন একেবারেই মনে নেই তার।

ভাত ফুটে গেলে শমিতার হাত থেকে ডেকচিটা একরকম জোর করে নিয়ে সিঙ্কে ফেন গালে পারুল।

কিচেনের গা ঘেঁষে বড় ডাইনিং-রুম। সেখানে একটা লম্বাটে টেবল ঘিরে

ছ'টা গদিমোড়া আরামদায়ক চেয়ার। সাদা ধবধবে দুটো প্লেটে মাখন, কাঁচালঙ্কা ইত্যাদি সাজিয়ে ডাইনিং-রুমে এনে টেবলে রাখে শমিতা। বলে, 'খেতে বসো।'

টেবল চেয়ারে বসে আগে কখনও খায়নি পারুল, বলে, 'আমি নিচে বসে খাচ্চি—'

'নিচে খেতে হবে না। কত রকম নোংরা-টোংরা থাকে—'

'এতকাল তো মেজেয় বসেই খেইচি।'

'তা হোক। আমার কাছে যখন এসেছ তখন টেবল চেয়ারেই খাবে।'

অগত্যা খুব জড়সড় হয়ে চেয়ারে বসে পারুল। তারপর মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অবাক হয়ে শমিতা জিজ্ঞেস করে, 'কী দেখছ?'

'ভাত।' পারুল বলে, 'এত সোন্দর ধপধপে গোটা গোটা সরু চালের ভাত আগে আর কক্ষণো দেখিনি। বেশির ভাগ দিন খুদের জাউ খেতাম, লইলে মোটা মোটা লাল চালের ভাত।'

এই দুঃখী, সরল মেয়েটার জন্য শুধু সহানুভূতিই না, অসীম মায়ায় মন ভরে যায় শমিতার। দারিদ্র্যের নানা করুণ কাহিনী সে শুনেছে কিন্তু সেটা যে এমন মর্মান্তিক, ভাবতে পারেনি। ভারি গলায় বলে, 'আমার কাছে যে ক'দিন থাকবে এরকম ভাতই খাবে।'

দুই চোখ খুশিতে আলো হয়ে যায় পারুলের।

খাওয়া শেষ হলে এঁটো প্লেট এবং গ্লাস সিঙ্কে নিয়ে যায় পারুল। শমিতা বাধা দেয় না। সে জানে বারণ করলেও মেয়েটা শুনবে না।

পারুল বলে, 'বাসন ধোয়ার ছাই লেই?'

শমিতা বলে, 'ওগুলো রেখে দাও। সকালে কাজের লোক আসবে, সে-ই ধোবে।'

কিন্তু পারুল কথাটা কানেই তুলল না। অগত্যা গুঁড়ো সাবানের একটা পাত্র দেখিয়ে শমিতা বলে, 'ছাই না, সাবান দিয়ে প্লেট ধুতে হয়।'

প্লেট আর গ্লাসগুলো ধুয়ে মুছে খুব যত্ন করে সাজিয়ে রাখে পারুল।

তারপর শমিতা তাকে একটা বেডরুমে নিয়ে যায়। বলে, 'তুমি এখানে শোও—' বলে নিজের ঘরে চলে আসে।

দেওয়ালের ইলেকট্রনিক ঘড়িটায় এখন দশটা বেজে চল্লিশ। রাত্তিরে এত তাড়াতাড়ি শোওয়ার অভ্যাস নেই শমিতার। কিন্তু শরীরে তিন দিনের ক্লান্তি নিয়ে আজ দমদমে নেমেছিল সে, তারপর এয়ারপোর্টে পাবুলকে ঘিরে সেই ঘটনাটার সঙ্গে জড়িয়ে যাবার পর আর কোনো দিকে লক্ষ ছিল না তার। এখন আর উত্তেজনা নেই, ক্লান্তিটা আবার ফিরে এসেছে। দু'চোখ জুড়ে আসতে লাগল শমিতার। জিরো পাওয়ারের একটা নীলাভ আলো জ্বেলে বিছানায় নিজেকে সঁপে দেয় সে।

চার

ঘুমটা যখন গাঢ় হতে শুরু করেছে সেই সময় টেলিফোন বেজে ওঠে। এই স্যুইটটায় দুটো ফোন। একটা আছে ড্রইংরুমে, আরেকটা শমিতার বেডরুমে। শোওয়ার ঘরের ফোনটাই এখন বাজছে।

পলকে ঘুম ভেঙে যায় শমিতার। এত রাতে তার কথা কার মনে পড়ল ভাবতে ভাবতে অসীম বিরক্তিতে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে বিপাশার গলা ভেসে আসে।

'আজ দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত তিনবার তোকে ফোন করেছি। রিং হয়েই যায়, রিং হয়েই যায়, নো রেসপন্স।'

'আমি তো বম্বে গিয়েছিলাম।'

'সে তো জানিই। বলেছিলি না আজ মর্নিং ফ্লাইটে ফিরে আসবি ?'

'মর্নিং ফ্লাইটটা বম্বে থেকে ছাড়ল অনেক লেট করে। এখানে আসার পর এমন একটা প্রবলেমে জড়িয়ে গেলাম যে ফ্ল্যাটে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে গেল। এই সবে শুয়েছি—'

'কী প্রবলেম ?'

'বলতে অনেক সময় লাগবে। পরে শুনিস। এত বার ফোন করেছিলি কেন ? এনিথিং আর্জেন্ট ?'

'ভেরি মাচ আর্জেন্ট।'

ভেতরে ভেতরে কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে শমিতা। তবে নিজের

মনোভাবটা বাইরে বেরিয়ে আসতে দেয় না। বেশ স্বাভাবিক গলায় বলে, 'যেমন—'

একটু চুপ করে থাকে বিপাশা। তারপর যখন কথা বলে তার গলার স্বরটা চাপা শোনায়, 'কাল আমি যোধপুর পার্কে গিয়েছিলাম।'

খবরটা নতুন বা চমকপ্রদ কিছু নয়। মাঝে মাঝে বিপাশা ওখানে যায়। যোধপুর পার্কে তার পিসিমার বাড়ি। যে অরূপের সঙ্গে শমিতার ডিভোর্স হয়ে গেছে সে ওর আপন পিসতুতো দাদা।

বিপাশা সম্পর্কে শুধু তার ননদই নয়, বন্ধুও। একসঙ্গে তারা লেডি ব্র্যাবোর্ন থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পাস করেছিল। সে-ই অরূপের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেয়। আলাপ, প্রেম এবং বিয়ে—এই তিনটে স্টেজ পেরুতে ওদের সময় লেগেছিল মাত্র তিন সপ্তাহ। এত তাড়াতাড়ি বিয়েটা হোক, তা কিন্তু একেবারেই চায়নি বিপাশা। সে ধীর, স্থির, কখনও আবেগের তোড়ে ভেসে যায় না। বিপাশা চেয়েছিল শমিতারা কিছুদিন পরস্পরকে জানুক, বুঝুক, তার ভেতর শমিতার এম. এ.'টা হয়ে যাক কিন্তু তখন তারা এতই আচ্ছন্ন যে এসব কানেই তোলেনি।

বিয়েটা কিন্তু আদৌ সুখের হলো না। এক বছরের মাথায় তাল কেটে গেল, তারপর আরো চার-পাঁচটা বছর জোড়াতাড়া দিয়ে সম্পর্কটা জিইয়ে রাখা হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারা গেল না। আলিপুর কোর্ট থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদের পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তাই খোলা ছিল না। ততদিনে অবশ্য তাদের মেয়ে ঝিলিকের জন্ম হয়েছে। ডিভোর্সের সময় ওর বয়স ছিল পাঁচ, গেল মাসে বারতে পা দিয়েছে।

অরূপরা ঝিলিকের স্বত্ব ছাড়েনি, একরকম জোর করেই ওকে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছে। অবশ্য মা হিসেবে মেয়েকে সে স্বাভাবিকভাবেই পেতে পারত। কিন্তু শমিতার যা কাজ তাতে সবসময় মেয়ের কাছে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ঐটুকু মেয়েকে একা রেখে বেরুনো যায় না। তাই মেয়ের দখল নিয়ে প্রাক্তন শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সে তিক্ততা করেনি। কোর্টের রায় অনুযায়ী ঠিক হয়েছিল সপ্তাহে একদিন গিয়ে শমিতা মেয়েকে দেখে আসতে পারবে। অফিসের কাজে বাইরে বাইরে থাকায় প্রতি সপ্তাহে ঝিলিকের সঙ্গে দেখাটা আর হয়ে ওঠে না, তবে যেখানেই থাকুক দু-একদিন পর পর তাকে ফোন

করে খবর নেয়। ঝিলিকের সঙ্গে সে যোগাযোগ রাখে—এটা কিন্তু একেবারেই চায় না অরূপের বাড়ির লোকজনেরা।

বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনাটার জন্য অরূপদের বাড়ির তো বটেই, তার নিজের মা-বাবা এবং আত্মীয়-স্বজনরাও তাকেই দায়ী করে আসছে, সবার অভিযোগের আঙুল তার দিকে। একমাত্র বিপাশাই সেই দলে নেই, সে তার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী।

বিপাশার জীবনে কিছু গোপন দুঃখ আছে। একটি যুবক কিছুদিন ওকে নিয়ে খেলার পর আচমকা অন্য মেয়েকে বিয়ে করে আমেরিকায় চলে যায়। এই বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথমটা ভেঙে পড়েছিল বিপাশা, পরে অবশ্য কষ্টটা সামলে নেয়। তবে এটা ঠিক, বিয়ে-টিয়ে সম্বন্ধে তার মোহভঙ্গ ঘটে গেছে। বহু মেয়ে আছে যাদের কাছে এসব ঘটনা জলের দাগের মতো। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করলে চিরকাল তা মনে রাখে না। পুরনো দুঃখের স্মৃতি মুছে ফেলে একদিন বিয়েটিয়ে করে পরম সুখে ঘর-সংসার করে। বিপাশা তাদের মতো নয়। সে থাকে যাদবপুরে তার দাদা-বৌদির কাছে, একটা কলেজে সে ইংরেজির লেকচারার। বিপাশা খুব চেষ্টা করেছিল, শমিতাদের সম্পর্কটা যাতে ভেঙে না যায়। কতবার যে তাকে এবং যোধপুর পার্কে গিয়ে অরূপদের বুঝিয়েছে তার ঠিক নেই। এমনকি ডিভোর্সের পরও থেমে যায়নি বিপাশা, যাতে তিক্ততা, মনোমালিন্য কেটে গিয়ে ওদের মধ্যে নতুন করে বোঝাপড়া হয় সেজন্য দু'জনকে বেশ কয়েক বার মুখোমুখি বসিয়ে দিয়েছিল কিন্তু কিছুই হয়নি, মাঝখানে যে চিড়টা ছিল সেটা আর জোড়া লাগল না।

এর জন্য অরূপকে পুরোপুরি দোষারোপ করে না শমিতা। কিন্তু তাদের দু'জনের মাঝখানে রয়েছে তার আস্ত শ্বশুরবাড়িটা— অরূপের মা, বাবা এবং দিদি। তাদের পেরিয়ে অরূপের কাছে পৌঁছুনো খুবই কঠিন ব্যাপার।

তবু প্রায়ই একটা কথা ভেবেছে শমিতা, ডিভোর্সের পরও সাত বছর বিয়ে করেনি অরূপ। সে শুনেছে তার বিয়ের জন্য ওর মা-বাবা এবং দিদি অনবরত চাপ দিয়ে গেছে কিন্তু তাকে রাজি করানো যায়নি। অরূপ মুখ ফুটে তাকে কিছু বলেনি, তবু শমিতার কখনও কখনও মনে হয়েছে, হয়তো অরূপ ভেবে থাকবে রাগ, অসহিষ্ণুতা এবং ভুল বোঝাবুঝি একদিন কমে আসবে। কোনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে শমিতাও তাই ভেবেছে। সময় তো কত অঘটনই

ঘটায়, কত উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়। কিন্তু মাস ছয়েক হলো সব জট পাকিয়ে দিয়েছে রাহুল—রাহুল ঘোষ। এমন বদ, ইতর, জঘন্য টাইপের লোক জীবনে আগে আর কখনও দেখেনি শমিতা। লোকটা রাহুর মতো তার পেছনে লেগে আছে। অবশ্য মাসকয়েক হলো সে মাদ্রাজে, সেটুকুই যা বাঁচোয়া। কিন্তু তার খবরটা নিশ্চয়ই যোধপুর পার্কে জানাজানি হয়ে গেছে, অন্তত বিপাশা কিছুদিন আগে সেই রকম আভাসই দিয়েছিল। কিছু কিছু প্রমাণও পেয়েছে শমিতা। গত আড়াই তিন মাসে বার চারেক নানা জায়গায় অরূপের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। এমনিতে অরূপ খুব ভদ্র. দেখা হলে এগিয়ে এসে কথা বলে, তার খোঁজখবর নেয়। কিন্তু এই চার বার তাকে দেখেও দেখেনি, স্রেফ এড়িয়ে গেছে।

শমিতা জিজ্ঞেস করে, 'যোধপুর পার্কে কী হয়েছে?'

বিপাশা বলে, 'তুই কিছু শুনিসনি?'

'না তো। কী শুনব?'

'লাস্ট কবে তুই ও বাড়িতে গিয়েছিলি?'

একটু চিন্তা করে শমিতা বলে, 'মাসখানেক আগে। কেন?'

বিপাশা বলে, 'কেউ তোকে কিছুই বলেনি?'

'না। ঝিলিক আর কাজের লোকরা ছাড়া কেউ তো আমার সঙ্গে কথা বলে না।'

'ঝিলিকও কিছু বলেনি? অবশ্য ও না-ও জানতে পারে।'

শমিতা বিরক্ত হচ্ছিল। বলে, 'আজেবাজে না বকে যা বলতে চাস পরিষ্কার করে বল।'

বিপাশা বলে, 'পিসি খুব সম্ভব আবার ছোটদার বিয়ে দেবে। ভেতরে ভেতরে সব ব্যবস্থা বোধহয় করে ফেলেছে।' সে অরূপকে ছোটদা বলে।

অরূপের বিয়ে সম্বন্ধে কানাঘুষো তো কতবারই শোনা গেছে কিন্তু সে সবের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু ওর মা যে সত্যিই বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন সেটা নতুন খবর বটে। শমিতা চমকে ওঠে। এর জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। আইনত অরূপের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। অরূপ যা খুশি করতে পারে, তবু কেন যেন শমিতার মনে হয়েছিল, কাটান-ছাড়ান হয়ে যাবার পরও কোনো এক অদৃশ্য সূক্ষ্ম গ্রন্থি তাদের আটকে রেখেছে, পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হতে

দেয়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে বিপাশা যা বলল, তাতে হৃৎস্পন্দন পলকের জন্য থমকে যায়। পরক্ষণে নিজেকে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ করে ফেলে সে। বলে, 'এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছিস কেন ? ওরা কী করবে না-করবে সেটা কমপ্লিটলি ওদের ব্যাপার।'

বিপাশা বলে, 'কেন তোকে শোনালাম সেটা তুই ভালই বুঝতে পারছিস।'

শমিতা উত্তর দেয় না।

বিপাশা বলে, 'তুই যদি চাস, একটা কাজ করতে পারি।'

শমিতার কৌতূহল হচ্ছিল ঠিকই তবু আগ্রহশূন্যের মতো জিজ্ঞেস করে, 'কী ?'

বিপাশা এবার বলে, 'তুই বললে ছোটদার সঙ্গে দু-একদিনের ভেতর তোর দেখা করিয়ে দেব।'

শমিতা বলে, 'কী লাভ ?'

'আমি জানি, ডিভোর্সটা ও মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। শেষ একটা চেষ্টা করে দেখা যাক না।'

'কাজ কিছুই হবে না। লাস্ট সাত বছরে আমাদের দেখা তো কম হয়নি। ব্যাপারটা কি জানিস ?'

'কী ?'

শমিতা ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলে, 'অরূপের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বলে বিশেষ কিছু নেই। উইক, ভেরি উইক। মা-বাবার ছায়ার বাইরে ও কোনোদিন বেরিয়ে আসতে পারবে না। আর আমার প্রবলেম ওকে নিয়ে যতটা তার অনেক গুণ বেশি ওর মা-বাবা, বিশেষ করে ওর মাকে নিয়ে।'

বিপাশা বলে, 'এই তোর শেষ কথা ?'

শমিতা একটু চুপ করে থাকে। তারপর নরম গলায় বলে, 'তুই আমার বন্ধু, ওয়েল-উইশার। আমার ভালর জন্যে সিনসিয়ারলি কম চেষ্টা করিসনি। কিন্তু একটা কথা ভেবে দ্যাখ, অরূপের পক্ষে ওর ঐরকম পজেসিভ ডমিনান্ট মাকে ছেড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব না, আমার পক্ষেও মাথা নিচু করে ফের ও বাড়িতে ঢোকা অসম্ভব। এসব নিয়ে আর ভেবে কী হবে!'

বিপাশা বিষণ্ন সুরে বলে, 'দ্যাখ শমি, ভবিষ্যতের কথা ভেবে, শান্তির জন্যে, বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্যে আমাদের অ্যাডজাস্ট করে চলতে

হয়। দিস ইজ দি রুল অফ লাইফ। অত অ্যাডামেন্ট হয়ে থাকলে চলে না। দু'পক্ষকেই কিছু-না-কিছু ছাড়তে হয়। যাক, ভাবলাম খবরটা দেওয়া উচিত, তাই দিলাম। যদি মনে হয় ছোটদার সঙ্গে কথা বলবি, আমাকে ফোন করিস।'

বিপাশা যে ক্ষুব্ধ হয়েছে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু শমিতা জানে অরূপের সঙ্গে দেখা করার মানে হয় না। এর আগের সাক্ষাৎকারগুলোর মতো এটাও তাদের কোথাও পৌঁছে দেবে না। দেখা হওয়া মানেই তো ঢাকনা খুলে প্রাক্তন দাম্পত্য জীবনের আবর্জনা ঘাঁটাঘাঁটি করা। ফের কিছু তিক্ততা, পারস্পরিক দোষারোপ, উত্তেজনা—যার নীট ফল অশান্তি। তাছাড়া এতদিন রাহুল ঘোষ ছিল না। তার কথা জানার পর অরূপ কি দেখা করতে রাজি হবে?

কিন্তু এসব নিয়ে কথা বাড়াতে আর ইচ্ছা হলো না শমিতার। সে বলল, 'ঠিক আছে, তোকে ফোন করব। হ্যাঁ রে, ঝিলিক কেমন আছে?'

বিপাশা বলে, 'ভাল।'

'আমার কথা কিছু বলল?'

'আমি যতক্ষণ ও বাড়িতে ছিলাম পিসিমা-পিসেমশাই কাছে বসে অনেক গল্প করলেন। ঝিলিকও ছিল কিন্তু ঠাকুমা-ঠাকুরদার সামনে একবারও তোর কথা মুখে আনল না। তবে—'

'কী?'

'আমি যখন চলে আসছি, দেখি গেটের কাছে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে ঝিলিক। আমাকে দেখে ও বেরিয়ে এল। বলল, তোর জন্যে সবসময় ওর মন খারাপ হয়ে থাকে। ছুটির দিনে দুপুরে ও-বাড়ির লোকেরা ভাত-টাত খেয়ে ঘুম লাগায়। সেই সময় তোকে ফোন করতে বলেছে।'

শমিতা চুপ করে থাকে। সে জানে মেয়ের সঙ্গে সপ্তাহে একদিনের বেশি দেখা করুক কিংবা ঘন ঘন ফোন করে কথা বলুক, সেটা একেবারেই চায় না অরূপের বাড়ির লোকজনেরা। ঝিলিকও সেটা বুঝে গেছে। তাই ঠাকুমা-ঠাকুরদার সঙ্গে তার এই লুকোচুরি। এই বয়সেই ওরা মেয়েটার সব সারল্য নষ্ট করে ওকে চতুর করে তুলছে।

বিপাশা তার সাড়া না পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কিরে, ফোন ছেড়ে দিলি নাকি?'

ভারি গলায় শমিতা বলে, 'না, বল।'

'পারলে দু-একদিনের ভেতর ঝিলিকের সঙ্গে গিয়ে দেখা করিস।'

'করব।'

'বম্বে যে গিয়েছিলি, কাজকর্ম কেমন হলো?'

'বেশ ভাল।'

'এবার ঘুমো। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

ফোনটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখে শমিতা কিন্তু তারপরও অনেকক্ষণ ঘুম আসে না। ঝিলিকের নানা বয়সের মুখ নির্বাক মন্তাজ ছবির মতো চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে। একসময় এই ছবিগুলো সরে যায়। হঠাৎ এক উজান স্রোতে শমিতা ফিরে যায় বছর এগার আগের সেই দিনগুলোতে।

বিয়ের পর অরূপদের বাড়িতে এসে প্রথম দিকে শমিতার মনে হয়েছিল জীবনের সবটুকু আনন্দ আর সুখ এখানে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। গোলমালটা সেখানেই বাধে যেখানে আর্থিক বা স্টেটাসের দিক থেকে বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ির মধ্যে পার্থক্যটা খুব বেশি থাকে। এখানে দুটো ফ্যামিলিই শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত এবং মোটামুটি বিত্তবান। অরূপদের মতো শমিতাদের বংশও বেশ বনেদি। অরূপদের নিজস্ব বাড়ি যেমন যোধপুর পার্কে তেমনি তাদের বাড়িও লেক টাউনে। অরূপের বাবা গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে রিটায়ার করেছেন, তার বাবা ছিলেন অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের বেশ বড় বিজ্ঞানী। অরূপের মা এবং দিদি, দু'জনেই ইংরেজির এম. এ.। শমিতার মা ফিলজফির এম. এ.। তার দাদা ইন্ডিয়ান রেভেনিউ সারভিসে রয়েছে, আপাতত দিল্লিতে পোস্টেড। অতএব মসৃণভাবেই শমিতার জীবন কেটে যাবার কথা। কিন্তু সমস্যাটা ছিল অন্য জায়গায়।

অরূপদের বাড়ির লোকজন, বিশেষ করে ওর মা ভীষণ কনজারভেটিভ। এমন নয় যে ভদ্রমহিলা চিরকাল পর্দানশীন হয়ে বাড়ির ভিতর কাটিয়ে দিয়েছেন। যথেষ্ট শিক্ষিত তিনি, ঘর থেকে কবেই পৃথিবীর মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে এসেছেন কিন্তু তিনি চান না, বাড়ির বৌ হুটহাট করে বাইরে বেরোক, পুরুষ বন্ধুবান্ধব নিয়ে হই হই করুক। পুরনো জবরদস্ত মেট্রিয়ার্কাল বা মাতৃতান্ত্রিক সোসাইটির মডেলটাকে তিনি নিজের সংসারে কায়েম করে রাখতে

চান। প্রবল কর্তৃত্বে মহিলা স্বামী ছেলে মেয়ে জামাই, সবাইকে হাতের মুঠায় পুরে রেখেছিলেন। যোধপুর পার্কের বাড়িতে তাঁর কথাই শেষ কথা, তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটা আঙুল তোলার সাহস কারো ছিল না। এমনকি তাঁর এক্স-প্রিন্সিপ্যাল স্বামীরও না। তাঁর মেয়ে অর্থাৎ অরূপের দিদিও তার মায়ের মতো একই ছাঁচ থেকে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে এসেছে। বিয়ে হয়ে গেলেও বেশির ভাগ সময়ই পড়ে থাকত যোধপুর পার্কে। বিয়ে হয়ে যাবার পরও কোনো মেয়ে যে বাপের বাড়ি ছেড়ে নড়তে চায় না, এমন নমুনা জীবনে এই একটাই চোখে পড়েছে শমিতার।

ছেলেমেয়ে এবং স্বামীর নাকে দড়ি পরানোর পর অরূপের মা মৃণালিনী হাত বাড়ালেন শমিতার দিকে। কিন্তু শমিতার নাক এতই উঁচুতে যে তাঁর হাত সেখানে পৌঁছুল না। আসলে শমিতার মধ্যে এমন একটা স্বাধীন, জেদী, একরোখা ব্যাপার রয়েছে যে তার ওপরে কেউ জোর করে কিছু চাপাতে চাইলে সে বুখে ওঠে। মৃণালিনী চেয়েছিলেন, তিনি যা বলবেন শমিতা মুখ বুজে তাই করবে, সারাক্ষণ চোখের ওপর থাকবে, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং স্বামীর সেবাযত্ন করবে। উনিশ শতকের সুশীলা রমণীদের মতো শ্বশুরবাড়ি, বিশেষ করে শাশুড়িই হবে তার ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু মৃণালিনীর মডেল অনুযায়ী পোষ-মানা গৃহবধূ হওয়ার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না শমিতার। কারো স্ত্রী বা পুত্রবধূ হওয়া ছাড়াও তার যে আলাদা একটা অস্তিত্ব আছে সেটা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারত না শমিতা।

একটু আধটু খিটিমিটি বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই শুরু হয়েছিল কিন্তু অশান্তিটা বাড়ল যখন শমিতা দুম করে একটা চাকরি নিয়ে বসল।

মৃণালিনী খুবই রেগে গিয়েছিলেন। উত্তেজিত মুখে জিজ্ঞেস করেছেন, 'এর মানে কী ? হঠাৎ চাকরি নিলে ?'

শমিতা বলেছে, 'সারাদিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে আমার ভাল লাগে না, তাই—'

'এ বাড়ির মেয়ে কি বৌরা কেউ বাইরে কাজ করতে যায় না।'

'তা না যেতে পারে কিন্তু এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায় ?'

এমন একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না মৃণালিনী। কিছুক্ষণ তিনি স্তম্ভিত হয়ে ছিলেন। তারপর পালটা প্রশ্ন করেছিলেন, 'কত মাইনে ওরা

তোমাকে দেবে ?'

শমিতা বলেছে, 'একুশ শ সাতান্ন টাকা।'

'মাত্র ঐ ক'টা টাকার জন্যে তুমি চাকরি করতে গেছ!'

উত্তর না দিয়ে শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে থেকেছে শমিতা। শাশুড়ির উদ্দেশ্যটা কী, সে বুঝতে পারছিল না।

মৃণালিনী বলেছেন, 'ঐ টাকাটা প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে আমার কাছ থেকে নিও। কাল থেকে আর অফিস যেতে হবে না।'

'আপনার কাছ থেকে টাকা নেব কেন ?'

'টাকার জন্যেই তো চাকরি নিয়েছ। সেটা যেখান থেকে হোক পেলেই তো হলো।'

'না।'

'না মানে ?'

শমিতা বলেছে, 'টাকার জন্যে আমি চাকরি করছি না।'

অবাক হয়ে মৃণালিনী জিজ্ঞেস করেছেন, 'তবে কিসের জন্যে ?'

'আত্মবিশ্বাসের।' শমিতা বলেছে, 'দেখতে চেয়েছিলাম আমার কিছু ওয়র্থ আছে কিনা।'

'দেখা হয়ে গেছে। কালই অফিসে রেজিগনেশন পাঠিয়ে দেবে।'

শমিতা চুপ।

মৃণালিনী অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন, 'কী হলো, উত্তর দিচ্ছ না যে ?'

শমিতা স্থির চোখে শাশুড়িকে লক্ষ করতে করতে খুব শান্ত গলায় বলেছে, 'আজকাল কোনো মেয়েই আর ঘরে বসে থাকে না। সবাই কিছু-না-কিছু করছে। আমি করলে অসুবিধাটা কোথায় ?'

'তোমার তো কোনো অভাব নেই। তাছাড়া আমাদের ফ্যামিলি ট্রাডিশন তোমাকে ভাঙতে দেব না। এবাড়ির বউয়ের চাকরি করাটা আমাদের পক্ষে খুব অসম্মানজনক।'

'এ তো অদ্ভুত কথা !'

মৃণালিনী চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'তার মানে ?'

তার শাশুড়ির পা দুটো এই সেঞ্চুরির আশির দশকে থাকলেও তাঁর ধ্যানধারণা থেকে গেছে গত শতাব্দীতে। অতীব সংস্কারাচ্ছন্ন, নিজে যথেষ্ট

লেখাপড়া শিখলেও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচণ্ড বিরোধী। এমন মহিলা আগে আর কখনও দেখেনি শমিতা। এই সব কথা মুখ ফসকে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল তার। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলেছে, 'মেয়েদের চাকরি করাটা অসম্মানজনক, এ আপনি কী বলছেন মা! দেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ে কাজ করছে। সেটাকে আপনি খারাপ মনে করেন?'

'অন্য মেয়েদের সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই। আমি শুধু এবাড়ির বৌয়ের সম্বন্ধে বলেছি। তোমাকে কাল রেজিগনেশন দিতেই হবে।'

মৃণালিনীর ভেতর থেকে তাঁর ডিক্টেটরের চেহারাটা আগেই বেরিয়ে এসেছিল। ক্রমশ তিনি কঠোর হয়ে উঠছিলেন। এদিকে জেদ চেপে যাচ্ছিল শমিতার মাথায়। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে, এই মহিলার কাছে কোনোভাবেই মাথা নোয়াবে না। বলেছে, 'আপনি কি আমার ওপর পরদা প্রথাটা নতুন করে চাপিয়ে দিতে চাইছেন? ঘরের আসবাব হয়ে বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চাকরি আমি ছাড়তে পারব না।'

কেউ তাঁর মুখের ওপর এভাবে বলতে পারে, মৃণালিনীর কাছে তা ছিল অভাবনীয়। কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে থেকেছেন তিনি। তারপর গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠেছেন, 'তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এত বড় সাহস তোমার হলো কী করে?'

'স্পর্ধা বা সাহসের কথা আসছে কেন? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি।'

'ন্যায়-অন্যায় নিয়ে তর্ক করতে হবে না। আমি যা বলছি তাই করবে।'

এই চাকরির বিষয়ে ছেলের সঙ্গেও নিশ্চয়ই মৃণালিনীর কিছু কথা হয়ে থাকবে। একদিন রাত্তিরে অরূপ শমিতাকে বলেছিল, 'মা যখন চাইছে না তখন চাকরিটা না হয় না-ই করলে।'

শমিতা স্বামীর চোখে চোখ রেখে বলেছে, 'মায়ের ব্রিফটা শেষ পর্যন্ত তুমিই নিলে?'

'এভাবে বলছ কেন?'

তার কথার উত্তর না দিয়ে শমিতা বলেছে, 'তোমার মাকে জানিয়ে দিও তাঁর অন্যায় জুলুম আমি মেনে নেব না।'

বিমূঢ়ের মতো অরূপ বলেছে, 'জুলুম!'

'নয় তো কী? তোমাদের এত শিক্ষিত ফ্যামিলি। মেন্টালিটিটা নাইনটিনথ সেঞ্চুরির মতো কেন? তোমার মায়ের কি ধারণা, চাকরি করতে বেরিয়েছি বলে আমি নষ্ট হয়ে যাব! স্ট্রেঞ্জ!'

'মা কি নষ্ট হবার কথা একবারও বলেছে!'

'তা বলেননি, তবে এছাড়া আর কী হতে পারে?'

'মা হয়তো ভেবেছে, যখন প্রয়োজন নেই তখন কেন চাকরি করবে?'

'এর উত্তর তোমার মাকে আমি আগেই দিয়েছি। তবু তুমিও জেনে রাখো, আমি সেলফ-ডিপেনডেন্সে বিশ্বাস করি। আর্থিক স্বাধীনতাটা আমার দরকার। চাকরিটা আমি কোনোভাবেই ছাড়তে রাজি নই।'

দিশেহারার মতো অরূপ বলেছে, 'তুমি ভীষণ একগুঁয়ে। সামান্য একটু অ্যাডজাস্ট করে নিলে কোনো প্রবলেম থাকে না।'

শমিতা বলেছে, 'অ্যাডজাস্ট করতে আমি সবসময় রাজি যদি দেখি তার পেছনে সঙ্গত কারণ রয়েছে। কিন্তু তোমার মায়ের ডিক্টেটরশিপ আর খামখেয়ালিপনাকে খুশি করতে পারব না।'

অরূপের দিদি শোভনার সঙ্গেও এই নিয়ে প্রচুর কথা-কাটাকাটি হয়েছে শমিতার। অরূপের বাবা অবশ্য কিছু বলেননি, তবে অনেক বেশি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

মনে আছে অফিসের বন্ধুরা মাঝে মাঝে যোধপুরের বাড়িতে এসে হই-হুল্লোড় করে খানিকটা সময় কাটিয়ে যেত। এটা একেবারেই বরদাস্ত করতেন না মৃণালিনী।

অফিসের কলিগদের মধ্যে একজন বরুণ—বরুণ সেন। এমনিতে খারাপ না, তবে একটু গায়ে-পড়া, ফিচেল টাইপের। যোধপুর পার্কে তার যাতায়াতটা ছিল সবচেয়ে বেশি। হুটহাট সে হাজির হয়ে যেত। তার সঙ্গে শমিতাকে জড়িয়ে আবহাওয়া রীতিমতো গরম করে তুললেন মৃণালিনী। শুধু তাই না, সন্দেহের ভাইরাসটিকে সুকৌশলে ছেলের মনের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এমন কুচুটে, সন্দেহপরায়ণ মহিলা ভূ-ভারতে খুব বেশি একটা নেই।

পরিস্থিতি যখন এই পর্যায়ে সেই সময় একদিন থমথমে মুখে অরূপ বলেছিল, 'তুমি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছ।'

শমিতা বলেছে, 'আমি করেছি, না তোমার মা করেছেন! বরুণ ইজ

আ ডিসেন্ট পার্সন। একটু ফ্রিভলাস ধরনের ঠিকই, তবে ওর মধ্যে কোনোরকম নোংরামি নেই।'

'ভাল হোক খারাপ হোক, আমাদের কিছু যায় আসে না। মা যখন চাইছে না তখন আমাদের বাড়ি সে না এলেই পারে।'

'তুমি চাইছ আমি তাকে না আসার কথা বলি?'

'আমার কথা হচ্ছে না। পারিবারিক শান্তির জন্যে বললে ক্ষতি কী? মায়ের যখন ইচ্ছে নয়—'

তীব্র গলায় এবার শমিতা বলেছে, 'আমার পক্ষে বরুণকে বলা সম্ভব নয়। এতে তোমার মা যা-ই ভাবুন।'

অরূপ খুব বিরক্ত হয়েছিল। ঝাঁঝালো গলায় বলেছে, 'একটা বাইরের লোকের জন্যে মাকে অসম্মান করতে চাইছ কেন?'

'অসম্মান! বরুণের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে—ছিঃ! তোমার মায়ের যে এমন রুচি, আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এ আমি মেনে নেবো না। বরুণ আসবে।'

হঠাৎ যেন খেপে উঠেছে অরূপ, 'আমার মা সম্পর্কে তুমি অনেক সময় আজেবাজে কমেন্ট করেছ। এতদিন কিছু বলিনি, আমি আর সহ্য করব না।'

'কী করবে? মারবে?' শমিতাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছিল অরূপের। সে বলেছে, 'আমার রুচিটা ঐ লেভেলে এখনও নামেনি।'

কিন্তু হঠকারিতা, অসহিষ্ণুতা, উত্তেজনা—এসব এমনই বস্তু যা নিজের ঝোঁকে এগিয়ে চলে। রুক্ষ স্বরে শমিতা বলেছে, 'না নেমে থাকলে নামিয়ে ফেল।'

অসহায়ভাবে অরূপ এবার বলেছে, 'বিয়ের আগে ভাবতে পারিনি তুমি এই ধরনের—'

'জানলে কী করতে? বিয়েটা করতে না, তাই তো?'

অনেকক্ষণ মুখ নামিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে থেকেছে অরূপ। তারপর ক্লান্ত সুরে জিজ্ঞেস করেছে, 'একজাক্টলি তুমি কী চাও বল তো?'

শমিতা বলেছে, 'পিস অ্যান্ড ফ্রিডম। আমার স্বাধীনতায় কেউ অনধিকার

প্রবেশ করুক তা আমি চাই না।' একটু থেমে বলেছে, 'কিন্তু এ বাড়িতে সেটা সম্ভব না।'

অরূপ জিজ্ঞেস করেছে, 'তুমি কি অন্য কোথাও থাকার কথা ভাবছ ?'

'রাইট। তবে একা নয়, তোমার সঙ্গে।'

'আমি এই বাড়ি ছেড়ে যেতে পারব না।'

'জানতাম। ইউ আর পারফেক্টলি আ মাদারস সন। স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষার কথা তুমি ভাবতেও পার না।'

বরুণকে নিয়ে সমস্যাটা অল্প দিনেই মিটে গেছে। কোম্পানি হঠাৎ তাকে লখনৌ ব্রাঞ্চে বদলি করে দিয়েছিল। ফলে শমিতার সঙ্গে তার যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

জোড়াতালি দিয়ে আরো দু-তিনটে বছর কেটে গেল। এর মধ্যে ঝিলিক হয়েছে। একটি শিশুর মধ্যে এমন ম্যাজিক থাকে যা অনেক তিক্ততা এবং ভুল বোঝাবুঝি কমিয়ে দিতে পারে। যোধপুর পার্কে অশান্তির ঝাঁঝ কমে আসছিল।

কিন্তু হঠাৎ বিরাট একটা কোম্পানি থেকে (এখন এখানেই কাজ করছে সে) সেলস একজিকিউটিভ পোস্টের অফার পেয়ে যায় শমিতা। মাইনে শুরুতেই আট হাজার, তাছাড়া পার্কস, গাড়ি, হাউস রেন্ট, টেলিফোন ইত্যাদি বাদেও আরো নানারকম সুবিধা। কিন্তু সেলস প্রমোশনের জন্য প্রচুর ট্যুর করতে হবে। মাসের মধ্যে পনের কুড়ি দিনই থাকতে হবে বাইরে বাইরে।

বাড়িতে প্রচণ্ড আপত্তি উঠল। এতদিন কলকাতায় থেকে শমিতা অফিসে যাতায়াত করছিল, প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেটা তবু মেনে নিয়েছে সবাই কিন্তু বাড়ির বৌ মাসের অর্ধেক দিন বাইরে কাটাবে, সেটা বরদাস্ত করা অসম্ভব।

এবার সবচেয়ে বড় বাধাটা এসেছিল অরূপের কাছ থেকে। অরূপ একটা মাল্টিন্যাশানাল ফার্মে মোটামুটি ভাল পোস্টেই তখন ছিল কিন্তু শমিতাকে নতুন কোম্পানি যা অফার দিয়েছে সেই তুলনায় তার মাইনে বেশ কম। হয়তো সূক্ষ্মভাবে কিছুটা হীনম্মন্যতা তার মধ্যে কাজ করে থাকবে। সে বলেছে, 'এই অফার অ্যাকসেপ্ট করো না।'

শমিতা অবাক। বলেছে, 'কী বলছ তুমি ! এমন চান্স কেউ ছেড়ে দেয় !' সে কারো কোনো কথা শোনেনি, সবার আপত্তি সত্ত্বেও নতুন চাকরিটা

নিয়েছিল। তারপর শর্ত অনুযায়ী আজ গৌহাটি, কাল বাঙ্গালোর, পরশু বম্বে—এই করে বেড়িয়েছে। কলকাতায় যখন থাকত তখন প্রায়ই পার্টি লেগে থাকত। বেশির ভাগ দিনই মধ্যরাতের আগে ফেরা সম্ভব হতো না শমিতার পক্ষে। পার্টিতে যেত ঠিকই কিন্তু কখনও ড্রিঙ্ক করেনি।

প্রথম চাকরিটা নেবার সময় বাড়িতে প্রচুর হই-চই হয়েছে। এবার ঝড় উঠল। অরূপই শুধু না, শমিতার মা-বাবাও প্রবল অশান্তির ভয়ে সেলস একজিকিউটিভের চাকরিটা যাতে সে ছেড়ে দেয় সে জন্য কম বোঝাননি। কিন্তু তাকে কিছুতেই টলানো যায়নি। যোধপুর পার্কের বাড়িতে তখন এমন অবস্থা, যে কোনো মুহূর্তে যেন বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

চাকরির ব্যাপারে কেন যে সে এত জেদ ধরে ছিল সেটা তখন নয়, পরে ঠাণ্ডা মাথায় বহুবার ভেবে দেখেছে শমিতা। মূল কারণটা তার আর মৃণালিনীর মধ্যে সংঘাত। মৃণালিনী যতই জোর করে তার মাথা নুইয়ে দিতে চেয়েছেন, তার অনমনীয়তা ততই বেড়ে গেছে। আসলে তারা কেউ আপস করতে শেখেনি, দু'জনের কাছে তাদের 'ইগো'টাই ছিল প্রবল। তাছাড়া প্রথমটা না হলেও দ্বিতীয় চাকরিটার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বিরাট এক চ্যালেঞ্জ। সেলসের কাজটা বরাবরই পুরুষদের একচেটিয়া। কিন্তু শমিতার চিরকালই অ্যাডভেঞ্চারের দিকে ঝোঁক। সেলসের কাজে মেয়েরা যে পুরুষদেরও টেক্কা দিতে পারে সেটা দেখিয়ে দেবার জন্যও সে যেন নিজের সুখশান্তি ঘর-সংসার বাজি ধরে বসেছিল।

যাই হোক, দ্বিতীয় চাকরিটা নেবার পর মৃণালিনী সোজাসুজি তাকে বলেছিলেন, 'তোমাকে খুব স্পষ্ট করে একটা কথা বলতে চাই।'

শমিতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'কী?'

'এ বাড়িতে থেকে সেলসের চাকরি করা চলবে না। দুটোর একটা তোমাকে বেছে নিতে হবে।'

'চাকরি আমি ছাড়ব না।'

'এটাই কি তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে নিজের ব্যবস্থা অন্য জায়গায় করে নাও।'

এত রূঢ়ভাবে আগে আর কখনও বলেননি মৃণালিনী। পলকহীন কিছুক্ষণ

শাশুড়িকে লক্ষ করেছে শমিতা, কোনো উত্তর দেয়নি। পরে অরূপকে তার মায়ের কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'তোমার মা আমাকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছেন। তুমি কী বল ?'

অরূপ তিক্ত গলায় বলেছে, 'আমার আর কী বলার থাকতে পারে ? সমস্ত ব্যাপারটা তুমিই তো জটিল করে তুলেছ।'

শমিতা বুঝতে পেরেছিল মৃণালিনীর মতামতের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবে না অরূপ। তবু সে জিজ্ঞেস করেছে, 'তুমি কি চাও না, আমি এখানে থাকি ?'

অরূপ চুপ করে থেকেছে।

একটু চিন্তা করে শমিতা বলেছে, 'যা ঘটেছে, তারপর এবাড়িতে আমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়। কোম্পানি থেকে আমি একটা বাড়ি পেতে পারি। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে ?'

অরূপ বিব্রতভাবে বলেছে, 'তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমার পক্ষে নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব না।'

শমিতা সেদিনই যোধপুর পার্ক থেকে লেক টাউনে তার মা-বাবার কাছে চলে গিয়েছিল। ঝিলিককেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু মৃণালিনীরা জোর করেই ওকে আটকে রেখেছিলেন।

লেক টাউনেও তিন-চার সপ্তাহের বেশি থাকতে পারেনি শমিতা। মেয়ে বাইরে বাইরে বেশির ভাগ সময় ঘুরে বেড়াক, কিংবা কলকাতায় থাকলে মাঝরাতে পার্টি থেকে বাড়ি ফিরুক, এসব মেনে নেবার মতো উদারতা তার মা-বাবারও ছিল না।

শমিতা টের পাচ্ছিল, বাপের বাড়িতেও সে অবাঞ্ছিত। শেষ পর্যন্ত রাগ এবং ক্ষোভের মাথায় ল্যান্সডাউনে তাদের কোম্পানির এই স্যুইটে এসে ওঠে।

এখানে আসার পর মাসখানেকও কাটে না, মৃণালিনীরা ডিভোর্স কেস করলেন। কিছুদিনের মধ্যে অরূপের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

বিবাহবিচ্ছেদের পরও অনেক বার অরূপের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বিপাশাও তাদের যোগাযোগ করে দিয়েছে কিন্তু মৃণালিনী যোধপুর পার্কে নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ী যেসব নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছেন সেটা টপকে

বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি অরূপের পক্ষে। তারপর আজ বিপাশার কাছে তো জানাই গেল, তার বিয়ের তোড়জোড় চলছে।

প্রথমটা নিস্পৃহ থাকতে চেষ্টা করেছিল শমিতা কিন্তু কখন দু'চোখ জলে ভরে গেছে নিজেই জানে না। কত রাত পর্যন্ত সে জেগে রইল তার খেয়াল নেই। একসময় নিজের অজান্তে চেতনার শেষ অন্তরীপটি গভীব ঘুমে ডুবে যায়।

পাঁচ

খুব ভোরে ওঠা শমিতার বহুদিনের অভ্যাস। আজও পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে গেল।

কাল সমস্ত শরীরে অসীম ক্লান্তি জমে ছিল, তাছাড়া এমন ঘটনাবহুল উত্তেজক দিনও তার জীবনে কম এসেছে। ক্লান্তি, উত্তেজনা, শিহরন এবং দুশ্চিন্তা মিলিয়ে তার উপর দিয়ে কাল যে ঝড় বয়ে গেছে তাতে আরো দু-তিন ঘন্টা ঘুমের দরকার ছিল। কিন্তু পুরনো অভ্যাস তাকে শুয়ে থাকতে দেয় না। ফলে কপালের দু'পাশের অদৃশ্য শিরাগুলি সমানে লাফাতে থাকে। চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে আর মাথার ভেঁতরটা কেমন যেন ভার ভার। সারা গায়ে ভোঁতা ধরনের কষ্টদায়ক একটা অনুভূতি একেবারে অনড় হয়ে আছে।

ঘুম ভাঙার পর ঝিলিক, মৃণালিনী, বিপাশা, অরূপ বা তার দু' নম্বর বিয়ের তোড়জোড়—কোনো কিছু মনে পড়ল না শমিতার। পারুলের মুখটাই চোখের সামনে অদৃশ্য টিভির পর্দায় ফুটে উঠল।

চিন্তাগ্রস্তের মতো বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকে যায় শমিতা। কিছুক্ষণ পর মুখটুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে দেখে ড্রইংরুমের যে ধারটা জানালার দিকে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকজন গাড়িটাড়ি দেখছে পারুল। কখন তার ঘুম ভেঙেছে, কে জানে।

শমিতা কয়েক পলক পারুলকে লক্ষ করে। তারপর ডাকে, 'এই পারুল—'

মেয়েটা চমকে ওঠে, মুখ ফিরিয়ে শমিতাকে দেখে শশব্যস্তে দৌড়ে আসে।

শমিতা জিজ্ঞেস করে, 'কখন ঘুম ভাঙল ?'

'অনেকক্ষণ, ত্যাখনও খানিক খানিক আঁধার ছিল।'

বোঝা গেল, ভোরে ঘুম থেকে ওঠা পারুলেরও অভ্যাস। শমিতা বলে, 'তুমি চা খাও ?'

পারুলের চোখ চকচকিয়ে ওঠে, 'খাই তো, কিন্তুন আমাদের গাঁ-ঘরে রোজ রোজ পাচ্চি কুতায় ? গেল মাসের গোড়ার দিকি একবার খেয়েছিলাম, তার আগে—'

শমিতা দাঁড়ায় না, সোজা কিচেনে গিয়ে গ্যাস জ্বেলে চা বসিয়ে দেয়।

পারুলও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। কালকের মতোই গভীর আগ্রহে গ্যাস জ্বালা-টালা লক্ষ করে। বলে, 'মেমসাহেব, আপনি ঘরে গে বসেন, আমি চা করে উনুন নিভোয়ে দে যাচ্চি।'

শমিতা চমকে ওঠে, 'না না, গ্যাসে হাত দিতে হবে না। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে বিপদ হয়ে যাবে।'

'ইদিক উদিক হবে না। আমি দেকিচি আপনি কী করে উনুনটা ধরালেন, নিভোলেন—'

কী ভেবে শমিতা বলে, 'আচ্ছা নিভোও দেখি, তারপর জ্বালো।'

চোখের পলকে গ্যাস নিভিয়ে ফের ওভেন ধরায় পারুল। কে বলবে এই প্রথম সে গ্যাসের উনুনে হাত দিল। গ্রামের মেয়ে হয়েও সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। একবার কিছু দেখলে ভোলে না, সব মনে করে রাখে।

শমিতা বলে, 'ঠিক আছে, আমি কাছে দাঁড়াচ্ছি। তুমি চা কর দেখি।'

পারুল হাসে, 'আপনি বুঝিন আমার পরে ভরসা করতি পারচেন না ? তা হলি দেঁড়ায়ে দেঁড়ায়ে দ্যাকেন।'

চা হয়ে গেলে একটা প্লেটে খানকতক বিস্কুট সাজিয়ে শমিতা বলে, 'চল, ড্রইংরুমে গিয়ে বসি।'

বাইরের ঘরে এসে একটা সোফায় বসে শমিতা, কিন্তু পারল বসে মেঝেতে। শমিতা জানে, হাজার বললেও তার সামনে পারুল কিছুতেই উঁচু জায়গায় বসবে না, হয়তো সে ধৃষ্টতা মনে করে। যদিও বা বসে, ভীষণ

জড়সড় হয়ে থাকে।

চা খাচ্ছে ঠিকই কিন্তু শমিতার মাথার ভেতর সেই চিন্তাটা স্বয়ংক্রিয় কোনো নিয়মে চলছেই। পারুলের জন্য কী ব্যবস্থা করবে সে? কাল রাতটা কোনোরকমে তো কেটে গেছে কিন্তু আজ ভোর হতে-না-হতেই সমস্যাটা বিশাল আকার নিয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ পারুল ডাকে, 'মেমসাহেব—'

শমিতা তার মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকায়।

পারুল বলে, 'একটা কথা শুদবো?'

'কী?'

'আপনার এই বাড়িতে আর কেউ থাকে না?'

এরকম একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না শমিতা, আচমকা বুকের ভেতর মৃদু একটা ধাক্কা খায়। হয়তো ভাবে সবাই ছিল তার, এই ফ্ল্যাটে তার থাকার কথাও নয়, তবু একা একা থাকতে হচ্ছে। কিন্তু এটা তো আর পারুলকে বলা যায় না। উদাসীন ভঙ্গিতে শুধু জানায়, 'না।'

শমিতা জানে এ জাতীয় সরল গেঁয়ো মেয়েদের কৌতূহলটা ভীষণ বেশি। সেটা শুরুতেই বন্ধ করে দেওয়া দরকার। গম্ভীর মুখে ফের বলে, 'ওসব কথা থাক।'

পারুল থতমত খেয়ে যায়, এ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন করে না।

চা খাওয়া শেষ হতে-না-হতেই মায়া আসে। সাতাশ-আটাশ বছরের শক্তপোক্ত নিরেট চেহারার মেয়েমানুষ। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায় সাত ঘাটের জল খাওয়া, এবং অত্যন্ত তুখোড়। তার সাজের বাহার আছে। একটা প্রিন্টেড সিল্কের শাড়ি সামান্য উঁচু করে পরা, শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজ। মাথায় আঁটো করে বাঁধা খোঁপা, তাতে ডজনখানেক রুপোর ঘুন্টি-দেওয়া কাঁটা গোঁজা। এই সকালবেলাতেই চোখে সরু কাজলের টান, গা থেকে সস্তা সেন্টের গন্ধ উঠে আসছে। কপালের মাঝখানে গাঢ় সবুজ রঙের মস্ত টিপ। কাঁধে ব্যাগ। ঐ ব্যাগটায় ছোট আয়না, চিরুনি, ছোট ক্রিম আর পাউডারের কৌটো ইত্যাদি টুকিটাকি সাজগোজের জিনিস ছাড়াও রয়েছে একটা দারুণ ফ্যাশনেবল গগলস। শমিতা জানে কাজের বাড়িতে ঢোকার আগে ওটা খুলে ব্যাগে পোরে মায়া, আবার রাস্তায় বেরিয়ে ফের চোখে লাগায়।

পারুলকে দেখে মায়া বলে, 'এ কে গো?'

শমিতা চট করে উত্তরটা ঠিক করে নেয়। বলে, 'মা পাঠিয়ে দিয়েছে।'

পারুল চমকে শমিতার দিকে তাকায়। সে নিজের পরিচয়টা দিতে যাচ্ছিল, চোখের ইশারায় তাকে মুখ বুজে থাকতে বলে শমিতা।

সন্দিগ্ধ চোখে আরো কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে মায়া জিজ্ঞেস করে, 'এ কি আপনার কাছে এখন থেকে থাকবে?'

তার কাজের একটি ভাগীদার জুটেছে কিনা সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে চায় মায়া। তার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে শমিতা বলে, 'আপাতত আছে কিছুদিন। তারপর দেখা যাক।'

আজ মায়া বেশিক্ষণ থাক, এটা এই মুহূর্তে একেবারেই চাইছে না শমিতা। পারুলের জন্য কী করা যায়, অফিসে বেরুবার আগে সেটা ঠিক করে ফেলতে হবে। মায়া চোখের সামনে থাকলে ঠাণ্ডা মাথায় সেটা ভাবা যাবে না। শমিতা বলে, 'আমি আজ তাড়াতাড়ি বেরুব। তুমি এখন এসো।'

রীতিমত অবাক হয়ে যায় মায়া। বলে, 'চলে যেতে বলচেন দিদি!'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ঘরের কাজকম্ম—'

'আজ আর কিছু করার দরকার নেই।'

'তবে কি—' বলতে বলতে থেমে যায় মায়া।

তার মনোভাবটা বুঝে নিয়ে শমিতা বলে, 'ভয় নেই। তোমাকে ছাড়িয়ে দিচ্ছি না। যেমন আসছিলে, কাল থেকে তেমনি আসবে।'

চাকরি সম্বন্ধে মায়া আশ্বস্ত হলেও সন্দিগ্ধ চোখে পারুলকে দেখতে দেখতে একসময় চলে যায়।

শমিতা একবার ভাবে, আজ অফিসে যাবে কিনা। পরক্ষণে তার মনে হয়, না গিয়ে উপায় নেই। বম্বেতে এ ক'দিন সে কী করেছে তা জানার জন্য অফিস উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। সে ঠিক করে ফেলে পারুলকে স্যুইটে রেখেই সে অফিসে যাবে। দু-একদিনের মধ্যে মেয়েদের কোনো হোমে ওর থাকার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, অফিস থেকে তার খোঁজখবরও নিতে হবে।

শমিতা বলে, 'পারুল, কিছুক্ষণ পর আমাকে বেরুতে হবে।'

পারুল বলে, 'কোথায়?'

শমিতা বলে, 'আমার অফিসে। যতক্ষণ না ফিরছি তোমাকে এখানে একলা থাকতে হবে।'

পারুল বেশ ঘাবড়ে যায়। বলে, 'আপনি কখুন ফেরবেন ?'

'যত তাড়াতাড়ি পারি। তবে বিকেলের আগে আসতে পারব বলে মনে হয় না।'

পারুল চুপ করে থাকে।

শমিতা জিজ্ঞেস করে, 'কি, ভয় করবে ?'

খানিকটা সাহস জড়ো করে দ্বিধান্বিতভাবে পারুল বলে, 'না।'

'এখন যা বলি খুব মন দিয়ে শোন। আমি বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাব। লোকে ভাববে ভেতরে কেউ নেই। তবু যদি কেউ দরজায় ধাক্কা মারে বা বেল বাজায় একদম সাড়া দেবে না।'

'কলকাতায় অনেক খারাপ লোক থাকে, না ?'

এই শহরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পারুলের যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ জাতীয় ধারণা করাটা তার পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়। কলকাতায় কত যে বদলোক নানা মতলবে বিষাক্ত জীবাণুর মতো কিলবিল করছে তা বললে আরো ভয় পেয়ে যাবে পারুল। একটু চিন্তা করে শমিতা বলে, 'তোমাকে যা বললাম তাই করবে। তা হলে কোনো ভয় নেই। আরেকটা কথা—'

পারুল জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়, 'কী ?'

'আমি যখন থাকব না, গ্যাসের উনুনে একদম হাত দেবে না। অসাবধান হলে ভীষণ বিপদ হয়ে যাবে।'

পারুল বলে, 'না না, শুদু শুদু হাত দিতে যাব কেন ?'

'এবার চল তোমার জন্যে রান্না করে রেখে যাই।'

'আমার একলার জন্যি ? আপনি খাবেন না ?'

শমিতা বলে, 'দুপুরে আমি বাড়িতে খাই না।'

পারুল বলে, 'আমার জন্যি অত হ্যাঙ্গামের কী দরকার ! আপনি ফেরলে ওবেলা দেখা যাবে।'

'তুমি দুপুরে না খেয়ে থাকবে, তাই কখনও হয় নাকি ? গ্যাসের উনুনে কতক্ষণ আর লাগবে !'

পারুল বলে, 'আপনি আমারে রেঁদে দেবেন, আর আমি তা খাব ! চাল-

ডাল দ্যান, আমি ফুটোয় নিচ্ছি।'

কিচেনে এসে শমিতা চাল ডাল তেল মসলা আলু পেঁয়াজ বার করে দেয় পারুলকে। তারপর ডিপ ফ্রিজ থেকে বার করে মাছ।

চাল ডাল ধুয়ে ওভেনের ওপর দুই ডেকচিতে চাপিয়ে দেয় পারুল। তারপর মাছে নুন-হলুদ মেশাতে মেশাতে বলে, 'আপনারে আমার রান্না খাওয়াতে পারব না, বড্ড দুঃখু হচ্চে।'

তার বলার ভঙ্গিতে এমন এক আন্তরিকতা আর অভিমান রয়েছে যা শমিতাকে বেশ নাড়া দেয়। সে বলে, 'ঠিক আছে, ওবেলা তোমার রান্না খাব।'

পারুলের মুখ খুশিতে ঝলমলে দেখায়। বলে, 'খেয়ে দেখবেন আমি খুব অখাদ্যি রাঁদি না।'

হাসিমুখে শমিতা বলে, 'দেখব।'

'তবে—'

'কী ?'

'কলকাতার মানুষদের মতো সায়েবি রান্না কিন্তু রাঁদতে শিখিনি।'

শমিতা হেসে ফেলে। বলে, 'ঠিক আছে, তুমি বাঙালি রান্নাই খাইও।'

রান্নার জিনিসপত্র বার করে দেবার পরও কিচেন থেকে চলে যায় না শমিতা, একটা মোড়ার ওপর বসে থাকে। যদিও নির্ভুলভাবেই গ্যাসের উনুন জ্বেলেছে পারুল তবু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না।

পারুল এবার বলে, 'একটা কথা বলব মেমসাহেব ?'

'কী ?'

'আপনার এখেনে যে কাজ করে তারে অনেক টাকা দ্যান, তাই লয় ?'

অর্থাৎ মায়ার কথা জিজ্ঞেস করছে পারুল। শমিতা বলে, 'কেন বল তো ?'

'আমি য্যাখন রইচি ঐ মেয়েমানুষটারে টাকা দেবেন কেন ? আমি সব কাজ করে দেবো।'

শমিতা তাকে বদমাশদের হাত থেকে উদ্ধার করে এনে আশ্রয় দিয়েছে। সেজন্য শতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইছে পারুল। তার হয়তো ধারণা, মায়াকে ছাড়িয়ে কিছু টাকা বাঁচিয়ে দিলে শমিতা খুব খুশি হবে। পরক্ষণে একটা কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে বেশ ধাক্কা খায় সে। পারুল কি ধরেই

নিয়েছে তার কাছে চিরকাল থেকে যাবে?

শমিতা পারুলের কথার উত্তর না দিয়ে বলে, 'আমি আর বসতে পারব না, অনেক বেলা হয়ে গেছে। স্নান করতে যাচ্ছি। রান্না শেষ হলে ঠিকমতো গ্যাস বন্ধ করতে পারবে তো?' আসলে পারুলকে এড়াবার জন্যই সে উঠে পড়ে। সেন্টিমেন্ট আবেগ ইত্যাদি কোনো ব্যাপারেই মেয়েটার সঙ্গে সে নিজেকে আর জড়াতে চায় না।

পারুল বলে, 'পারব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন।'

কিচেন থেকে বেরিয়ে শমিতা বাথরুমের দিকে পা বাড়াতে যাবে, হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে। ব্যস্তভাবে সেটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে যে গলাটা শোনা যায় তার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না সে। সেটা যেমন অভাবনীয় তেমনই অবাঞ্ছিত।

গলার স্বরটা রাহুলের। সে বলছিল, 'গুড মর্নিং শমি, মাদ্রাজ থেকে বলছি।'

শমিতার মনে পড়ে প্রায় মাসখানেক কি মাসদেড়েক বাদে ফোন করল রাহুল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোমাকে কতবার বলেছি আমাকে ডিসটার্ব করবে না। তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় বা রুচি কোনোটাই আমার নেই।'

অপমানটা গায়ে মাখে না রাহুল, একেবারে দু-কান কাটা। বলে, 'রেগে যাচ্ছ কেন? মন দিয়ে শোন, তোমাকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছি।'

'সুসংবাদ দুঃসংবাদ তোমার কোনো ব্যাপারেই আমার ইন্টারেস্ট নেই।'

'তোমার ইন্টারেস্ট না থাকতে পারে কিন্তু আমার যে খবরটা না জানালেই নয়। আসছে মাসে আমার অফিস ফের আমাকে কলকাতায় ট্রান্সফার করছে। আবার তোমার মধুর সঙ্গ লাভ করা যাবে।'

শমিতা চমকে ওঠে। যে যথেষ্ট সাহসী এবং একগুঁয়ে। ভয়-টয় তার খুবই কম, বিপদ-আপদে সে সহজে ভেঙে পড়ে না। ডিভোর্স হবার পর কত বাজে টাইপের লোক যে তার একা থাকার সুযোগ নিতে চেয়েছে তার হিসেব নেই। একসঙ্গে বসে আড্ডা দিক, ড্রিঙ্ক করুক, হই-হুল্লোড়ে আসর মাতিয়ে তুলুক—এসবে শমিতা কখনও আপত্তি করে না। তার অহেতুক শুচিবাই নেই। কিন্তু এর বেশি সে কাউকে এগুতে দেয় না। কয়েক জন যে চেষ্টা করেনি তা নয়, শমিতা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাদের স্যুইট থেকে বার করে

দিয়েছে। কিন্তু রাহুল একেবারে আলাদা ধাতুতে তৈরি। অন্যদের তবু স্ক্যান্ডালের ভয় আছে কিন্তু রাহুল বেপরোয়া। এমন ইতর জঘন্য জন্তু টাইপের লোক আগে কখনও দেখেনি শমিতা। সেক্স ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না।

কিন্তু সেক্সের ব্যাপারে এক ধরনের রক্ষণশীলতা রয়েছে শমিতার। সে সবার সঙ্গে সহজভাবে মেশে ঠিকই, কিন্তু কখনও চায় না মানুষ রাস্তার কুকুরের মতো নির্লজ্জ আচরণ করুক। কারো সঙ্গে একটা আবেগের সম্পর্ক গড়ে উঠলে আলাদা কথা। ডিভোর্সের পর তেমন কাউকে এখনও পায়নি শমিতা। এটা সত্যি, সে একেবারেই চায় না এদেশে ইওরোপ আমেরিকার মতো পারমিসিভ সোসাইটি গড়ে উঠুক।

অন্যদের ঠেকাতে পারলেও রাহুল যতদিন কলকাতায় ছিল তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। লোকলজ্জা, কুৎসা বা পুলিশের ভয় যাদের থাকে তাদের তবু থামানো যায় কিন্তু রাহুল এসবের বাইরে। একেক সময় শমিতার মনে হয়েছে পুলিশ দিয়ে ওকে টিট করবে কিন্তু পরক্ষণে ভেবে দেখেছে, পুলিশে যাওয়া মানেই বিশ্রী স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়া।

রাহুলের প্রচুর দুর্নাম। শমিতার ওপর তার নজর এসে পড়ার আগে আরো অনেক মেয়েকে নিয়ে কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিল সে। এমনকি বারকয়েক পুলিশও তাকে টানাটানি করেছে। তার বাবা তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন। কিন্তু রাহুলের স্বভাব বিন্দুমাত্র শোধরায়নি। সেক্সের ব্যাপারটা তার কাছে রোগের মতো। এমন এক বদমাশের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে লোকে তার দিকে আঙুল বাড়াক, সেটা একেবারেই কাম্য নয়।

'আমি ফোন রাখছি।' থমথমে গলায় বলে শমিতা।

শশব্যস্তে রাহুল বলে, 'প্লিজ—প্লিজ, লাইন কেটো না। তা হলে ফের রিং করতে হবে। স্যুইটে যদি তোমাকে না পাই, তোমার অফিসে ফোন করব। সেটা তোমার পক্ষে কিন্তু আরো এমব্যারাসিং হবে।'

যে কোনো ধরনের নোংরামি করার সাহস বা ক্ষমতা আছে রাহুলের। অফিসে ফোন করে কী কাণ্ড বাধিয়ে বসবে কে জানে। শমিতা বলে, 'কী চাও তুমি?'

'আপাতত কিছুই চাই না। আরেকটা ইনফরমেশন শুধু দিচ্ছি। ল্যান্সডাউনে তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি একটা হাই-রাইজে খুব সম্ভব একটা

ফ্ল্যাট পেয়ে যাব।'

'এসব আমাকে শুনিয়ে লাভ ?'

'কাছে থাকলে তোমার স্যুইটে যখন খুশি যাওয়া যেতে পারে, এই আর কি। যাক, এখন আর তোমাকে ডিসটার্ব করছি না। আসছে মাসে কলকাতায় আমার শুভাগমনের জন্যে প্রস্তুত থেকো। বাই—'

লাইন কেটে দেয় রাহুল। তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শমিতা। পরের মাস থেকে সারাক্ষণ যে তার বুকের ওপর দমবন্ধ-করা একটা আতঙ্ক চেপে বসবে, সেই চিন্তাতে ভীষণ ক্লান্ত বোধ করে সে। রাহুল কলকাতায় এলে তাকে কিভাবে ঠেকাবে, কোন পদ্ধতিতে আত্মরক্ষা করবে, সেটা এই মুহূর্তে ভাবা যাচ্ছে না, পরে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে ঠিক করতে হবে। পারুলের সঙ্গে আরেকটা ঝঞ্ঝাট এসে হাজির হল। কিন্তু ধৈর্য হারিয়ে ফেলাটা ঠিক হবে না। যা করার মাথা ঠাণ্ডা করে করতে হবে।

একসময় ফোন নামিয়ে রেখে বাথরুমে চলে যায় শমিতা। স্নান-টান সেরে ফিরে এসে পারুলকে বার বার সাবধান করে, বাইরে থেকে কেউ বেল বাজালে সে যেন সাড়া না দেয়, গ্যাসের ধারে-কাছে না যায়। পারুল মাথা নেড়ে জানায় যা বলা হলো তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, মেমসাহেব তার জন্য যেন দুশ্চিন্তা না করেন।

শমিতা বাইরে থেকে ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে চলে যায়।

ছয়

রাসেল স্ট্রিটে শমিতাদের ছ'তলা অফিস বিল্ডিংটা আগাগোড়া এয়ার-কন্ডিশানড। কার্পেট এবং ফ্যাশনেবল ক্যাবিনেট দিয়ে প্রতিটি কামরা এবং ক্লার্ক আর টাইপিস্টদের জন্য সংরক্ষিত হল-ঘরগুলো সাজানো।

লিফটে করে চারতলায় নিজের চেম্বারে চলে আসে শমিতা। হাতের অ্যাটাচি কেস টেবিলের ওপর রেখে আরামদায়ক রিভলভিং চেয়ারে বসে।

চেয়ারের পেছনের ভেলভেটে-মোড়া দেওয়ালে ইন্ডিয়ার বিরাট ম্যাপে বিভিন্ন শহরের যে সব নাম রয়েছে সেগুলোর ওপর লাল এবং সবুজ রঙের

গোল গোল চাকতি পিন দিয়ে আটকানো। কোম্পানির সেলস নেটওয়ার্ক সারা দেশে কিভাবে ছড়ানো হয়েছে, চাকতিগুলো থেকে মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। সবুজ চাকতিগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে ঐসব জায়গায় তাদের প্রোডাক্ট রমরম করে চলছে। যেগুলোতে বিজনেস ভাল নয়, সেখানে রয়েছে লাল চাকতি। ঐ শহরগুলোতে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য জোর দিতে হবে।

শমিতার আধখানা বৃত্তের মতো বিরাট গ্লাস-টপ টেবলের সামনে ডজনখানেক গদি-আঁটা চেয়ার, সেগুলো দর্শনার্থীদের জন্য। তার ডিপার্টমেণ্টের জুনিয়ার সেলস এগজিকিউটিভরাও মাঝে মাঝে ওখানে বসে তার সঙ্গে মার্কেটিং-এর ব্যাপারে কনফারেন্স করে। টেবলের ওপর নানা রঙের চারটে ফ্যাশনেবল টেলিফোন, টেবল-ক্যালেণ্ডার, সুদৃশ্য পেন-হোল্ডার এবং অজস্র ফাইল।

শমিতা অ্যাটাচি কেস থেকে কাগজপত্র বার করে পর পর সাজাতে থাকে। বম্বেতে তাদের নতুন প্রোডাক্ট বেচার জন্য সে যা যা করেছে এগুলো তারই রিপোর্ট। সেলস ডিভিসনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেণ্ট চক্রবর্তী সাহেবের কাছে এটা জমা দিতে হবে। এর জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে আছেন।

বোম্বেতে বসেই রিপোর্টটা তৈরি করে এনেছিল শমিতা। তবু সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে যাবার আগে আরেক বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিতে থাকে।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, দরজা খোলার শব্দে একটু চমকে ওঠে শমিতা। তার নিজস্ব বেয়ারা আবদুল কামরার ভেতর এসে সসম্ভ্রমে বলে, 'সেলাম দিদিজি।'

ঘড়ির দিকে না তাকিয়েও শমিতা বলে দিতে পারে এখন দশটা বেজেছে। কেননা রোজ কাঁটায় কাঁটায় দশটায় সে অফিসে এসে প্রথমে এই চেম্বারে ঢুকে সসম্ভ্রমে তাকে একটি সেলাম করে। শীত-গ্রীষ্ম বার মাস এই নিয়মের কোনো হেরফের হয় না।

মাঝবয়সী পাতলা ফর্সা চেহারার আবদুল অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী এবং অনুগতও। শমিতা তাকে খুবই পছন্দ করে। স্নিগ্ধ হেসে বলে, 'নমস্কার।'

এবার আবদুল কী করবে, সব মুখস্থ শমিতার। অন্যদিনের মতো সে টেবিলের ফাইলগুলো ক্ষিপ্রহাতে গুছিয়ে দেয়, তারপর গেলাস ভর্তি করে

জল এনে রাখে।

আজ অবশ্য জল রেখে সে চলে গেল না। জিজ্ঞেস করল, 'বম্বে থেকে কবে ফিরেছেন দিদিজি?'

রিপোর্টগুলোতে চোখ রেখে শমিতা অন্যমনস্কর মতো বলে, 'কাল—'

'ভাল ছিলেন তো?'

'হুঁ।'

আবদুল বুঝতে পারছিল, দিদিজি কাজে খুব ব্যস্ত আছেন। বেশি কথা বললে বিরক্ত হবেন। আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে দরজা টেনে দিয়ে একটা টুলের ওপর শিরদাঁড়া টান টান করে সে বসে থাকে। শমিতা কখন কলিংবেল বাজাবে সেজন্য কান খাড়া করে রাখে।

রিপোর্টটা দেখা শেষ হলো দশটা বেজে ষোলয়। সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আসবেন এগারটায়। হাতে চুয়াল্লিশ মিনিট সময় রয়েছে।

এতক্ষণ পারুলের কথা মাথায় ছিল না। হঠাৎ তাকে মনে পড়ে গেল। ফাঁকা স্যুইটে এখন কী করছে মেয়েটা? ফোন ধরাটা যদি জানতো একবার রিং করে তার খবর নেওয়া যেত। কিন্তু তার উপায় নেই। তবে কাল আর আজ যতটুকু সময় শমিতা দেখেছে, তাতে মনে হয়েছে পারুল যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। হুট করে দরজা খুলে বিপদ নিশ্চয়ই ডেকে আনবে না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, চতুর বদমাশেরা হাজার রকমের কৌশল জানে। হয়তো এমন কিছু করে বসল যাতে পারুল তাদের ফাঁদে পড়ে গেল। তখন?

এই সব ভাবনাচিন্তা যখন চলছে সেইসময় টেবিলের একটা ফোন বেজে ওঠে। তুলে রিসিভারটা কানে লাগাতে ভারি গলা শুনতে পায় শমিতা, 'গুড মর্নিং ম্যাডাম। আমি 'ইস্টার্ন হেরাল্ড'-এর সুরজিৎ। ভাবলাম, আপনাদের খবর নিই। মেয়েটাকে নিয়ে আর কোনো প্রবলেম হয়েছে?'

আশ্চর্য, আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে একবারও সুরজিতের কথা মনে পড়েনি। কিন্তু পড়া উচিত ছিল। অযাচিতভাবে পারুলের ব্যাপারে সে কাল পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয় শমিতা যেন তাকে জানিয়ে দেয়। শমিতার মনে হল, তার দুশ্চিন্তা যেন অনেকটাই কেটে গেছে। বলে, 'এখনও হয়নি। তবে কাল এয়ারপোর্ট থেকে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে এসে যখন নামি তখন মোস্ট প্রোবাবলি অন্য একটা

ট্যাক্সিতে সেই স্কাউন্ড্রেলটাকে দেখলাম—'

'তাহলে কি লোকটা আপনাদের ফলো করেছিল ?'

'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।'

'আপনি অফিসে চলে এসেছেন। মেয়েটা—কী যেন নাম—ও পারুল, সে কোথায় ?'

'আমার স্যুইটে।'

'সেখানে আর কে আছে ?'

শমিতা বলে, 'কেউ না। আপনি বোধহয় জানেন না আমি একাই একটা স্যুইট নিয়ে থাকি।'

'একা !'

'হ্যাঁ। আমি—আমি—'

সুরজিৎ বলে, 'আপনি কী ?'

বিব্রতভাবে শমিতা উত্তর দেয়, 'ডিভোর্সি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সুরজিৎ বলে, 'স্যরি, আমি জানতাম না। কিন্তু মেয়েটার সিকিউরিটির একটা ব্যাপার আছে। 'রোগ'গুলো যদি সত্যি সত্যিই আপনার স্যুইটে হানা দেয় তখন—' কথা শেষ না করে সে থেমে যায়।

পারুলের নিরাপত্তার জন্য কী ব্যবস্থা করে এসেছে, জানিয়ে দেয় শমিতা।

সুরজিৎ বলে, 'সবই তো বুঝলাম কিন্তু ওরা যে টাইপের লোক তাতে কখন কী করে বসবে কে জানে। তাছাড়া আরেকটা কথা ভেবে দেখেছেন ?'

'কী ?'

'ফাঁকা স্যুইটে একটা ইয়াং গার্ল একলা রয়েছে। এয়ারপোর্টের ঐ বদমাশগুলো ছাড়াও বাজে লোকের অভাব নেই। তারাও যদি টের পায়....মানে দিস ইজ ভেরি মাচ রিস্কি। আমি কী বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আশা করি।'

চিন্তাগ্রস্তের মতো শমিতা বলে, 'হ্যাঁ, প্রচণ্ড রিস্ক তো রয়েছেই।' তারপরেই হঠাৎ তার মনে হয় সাংবাদিকরা অনেক খবর রাখে, নানা জায়গায় তাদের যোগাযোগ। পারুলের ব্যাপারে তার কাছ থেকে নিশ্চয়ই ভাল পরামর্শ পাওয়া যাবে। তাকে এড়াবার ইচ্ছা থাকলে আজ আর কোনোভাবেই ফোন করত না।

শমিতা বলে, 'পারুলকে নিয়ে রিয়ালি আমি খুব সমস্যায় পড়ে গেছি মিস্টার সোম। সারাক্ষণ তো স্যুইটে থেকে ওকে আগলে রাখতে পারি না। আমার অফিস আছে। তাছাড়া আপনি হয়তো জানেন না, সারা মাসে মিনিমাম পনের দিন আমাকে অফিসের কাজে বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। পারুলকে সঙ্গে করে বাইরে যাওয়া একেবারেই সম্ভব না। আবার স্যুইটে রেখে যাব, তা-ও হয় না। কী যে করব ভেবে উঠতে পারছি না।'

খানিক চিন্তা করে সুরজিৎ বলে, 'পারুলকে মেয়েদের কোনো হোমে রেখে দিন না—'

শমিতা বলে, 'টেম্পোরারি ব্যবস্থা হিসেবে আমিও তা ভেবেছি। কিন্তু কোথায় এই সব হোম-টোম, কিছুই জানি না। আপনি তো জার্নালিস্ট। কাগজের লোকদের অনেক রকম কনট্যাক্ট থাকে। আপনার জানাশোনা কোনো হোম আছে কি?'

সুরজিৎ বলে, 'আছে। কিন্তু—'

'কী?'

'শুনেছি হোমগুলোর অ্যাটমসফিয়ার ভাল না।'

'আমিও সেইরকম শুনেছি। তবে সবগুলোই খারাপ, তা তো আর হয় না। দু-একটা কি আর ভাল নেই?'

'থাকতে পারে। কিন্তু কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, বলতে পারব না।'

শমিতা বলে, 'একটু খোঁজখবর নেওয়া যায় না?'

সুরজিৎ বলে, 'নিশ্চয়ই যায়। এক কাজ করতে পারেন?'

'বলুন—'

'আমি যে দু-তিনটে হোম চিনি, আপনাকে সেগুলোতে নিয়ে যেতে পারি। ওদের সঙ্গে কথা বলে যদি কনভিন্সড হন, পারুলকে রাখার ব্যবস্থা হতে পারে।'

সমস্যাটার সমাধান হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। উৎসুক সুরে শমিতা বলে, 'কবে নিয়ে যাবেন?'

সুরজিৎ বলে, 'যেদিন বলবেন—'

'আমি কালই যেতে চাই।'

'ঠিক আছে। সকালে, ধরুন ন'টা নাগাদ আমাদের বাড়ি যদি কষ্ট করে

চলে আসেন, আপনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি।'

'কতক্ষণ লাগবে ?'

'তিনটে হোমে নিয়ে যাব। একেকটা একেক জায়গায়। ঘন্টা চারেক সময় তো লাগবেই।'

শমিতা মনে মনে হিসেব করে দেখল সুরজিতের সঙ্গে তিন জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে দুপুর হয়ে যাবে। কে জানে কথাবার্তা বলতে বলতে আরো বেশি সময় লাগবে কিনা। সে স্থির করে ফেলে, কাল আর অফিসে আসবে না। পারুলের ব্যাপারে পুরোপুরি ভারমুক্ত হওয়াটা এখন সবচেয়ে জরুরি।

শমিতা খানিক চিন্তা করে বলে, 'আমি কি পারুলকে সঙ্গে নিয়ে যাব ?'

সুরজিৎ বলে, 'তাই আসুন। অত রিস্ক মাথায় নিয়ে মেয়েটাকে আপনার স্যুইটে রাখা ঠিক হবে না। আরেকটা কথা, কোনো হোমে পারুলের থাকার ব্যবস্থা হলে পুলিশকে জানিয়ে দিতে হবে।'

'অবশ্যই। আপনাদের বাড়ির ঠিকানাটা বলুন। কিভাবে যাব, যদি ডিরেকশানটা দেন।'

ঠিকানা জানিয়ে সুরজিৎ বলে, 'চেতলায় ঢুকে সোজা অহীন্দ্র মঞ্চের কাছে চলে আসবেন। ওটার পেছনেই আমাদের বাড়ি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'তা হলে কাল দেখা হচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই।'

শমিতা ফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে দেখতে পায়, তার চেম্বারের দরজা খুলে চক্রবর্তী সাহেবের বেয়ারা জগন্নাথ ভেতরে ঢুকছে। সেলাম করে একটা চিরকুট টেবলে রেখে পেপার ওয়েট চাপা দিতে দিতে বলে, 'সাহাব নে ভেজা হ্যায়।'

চিরকুটটা তুলে শমিতা দেখল দু'টি লাইন লেখা আছে : সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যেন সে অবিলম্বে দেখা করে। তিনি তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

'ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি আসছি।' জগন্নাথকে বিদায় করে বম্বের রিপোর্টটা একটা বড় ব্রাউন রঙের প্যাকেটে পুরে কামরা থেকে বেরিয়ে আসে শমিতা। পাঁচতলায় দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায় চক্রবর্তী সাহেবের চেম্বার,

সোজা সেখানে চলে যায় সে।

চক্রবর্তী সাহেবের বয়স ষাটের কাছাকাছি। রাশভারি হলেও তাঁর চেহারায় এক ধরনের প্রশান্তি রয়েছে। কাঁচাপাকা চুল ব্যাকব্রাশ করা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। শমিতাকে তিনি খুবই পছন্দ করেন, তার কর্মক্ষমতার ওপর ওঁর অগাধ আস্থা।

শমিতা চেম্বারে ঢুকে বলে, 'গুড মর্নিং স্যার—'

'গুড মর্নিং—' বিশাল টেবিলের উলটো দিকে একটা চেয়ার দেখিয়ে চক্রবর্তী সাহেব বলেন, 'বসো, বসো।' শমিতা বসলে জিজ্ঞেস করেন, 'তারপর বল, বম্বের খবর কী?'

শমিতা খাম থেকে রিপোর্টটা বার করে চক্রবর্তী সাহেবের সামনে রেখে বসতে বসতে বলে, 'ডিটেলে সব লিখে এনেছি স্যার—'

'ওসব পরে দেখব। তোমার মুখে আগে শুনি।'

বম্বে গিয়ে তাদের নতুন প্রোডাক্টের মার্কেটিংয়ের জন্য যা যা করেছে সমস্ত জানিয়ে শমিতা বলে, 'এতটা রেসপন্স পাব, ভাবতে পারিনি স্যার।'

চক্রবর্তী সাহেবকে খুব খুশি দেখায়। তাঁর গম্ভীর মুখে হাসির আভা ফোটে। বেশ উচ্ছ্বসিত সুরে বলেন, 'সত্যিই আনএক্সপেক্টেড। আমি জানতাম তুমি বম্বেতে দারুণ কিছু একটা করে আসবে।'

চক্রবর্তী সাহেব একেবারেই উচ্ছ্বাসপ্রবণ নন, বেশ স্বল্পভাষী। কিন্তু বম্বের সাফল্য তাঁকে বেশ চনমনে করে তুলেছে।

'বম্বের ব্যবস্থা তো করেছ। এবার সাউথের ভাস্ট মার্কেটটার দিকে নজর দাও।'

'স্যার, বম্বের মার্কেটে সবে ঢুকেছি। ওখানে বেশ কিছুদিন লেগে থাকতে হবে, নইলে কখন হাতছাড়া হয়ে যাবে কে জানে। বাজারটা ধরে রাখার জন্যে এখন অন্তত বছর খানেক ওটা নিয়ে পড়ে থাকা দরকার। সবটুকু থ্রাস্ট ওখানেই দিতে হবে।'

একটু চুপ।

তারপর শমিতা আবার বলে, 'বম্বেতে বেশ ক'টা বড় বড় কোম্পানি ফরেন কোলাবোরেশনে ঐ একই প্রোডাক্ট করে বাজারে ছেড়েছে। কম্পিটিশানটা টাফ। এতটুকু আলগা দিলে মুশকিল হয়ে যাবে।'

চক্রবর্তী সাহেব আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। শমিতার কথায় সায় দিয়ে বলেন, 'ঠিক বলেছ। বম্বের বাজার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার পর সাউথের ওপর জোর দিতে হবে। তবু আমার একটা সাজেশান আছে।'

জিজ্ঞাসু চোখে শমিতা তাকায়।

চক্রবর্তী সাহেব বলেন, 'বম্বেকে মেইন টার্গেট রেখেও ফাঁকে ফাঁকে মাদ্রাজ-বাঙ্গালোর-হায়দ্রাবাদেও যেও। ওই সব জায়গায় গ্রাউন্ড ওয়ার্কটা যদি করে রাখতে পার, ভবিষ্যতে কাজের সুবিধে হবে।'

'নিশ্চয়ই স্যার। আমি দু-তিন মাস পর থেকে সাউথে যাব।'

চক্রবর্তী সাহেব বলেন, 'ক'দিন বম্বেতে খুব পরিশ্রম করেছ। এখন দু'টো দিন বাড়িতে রেস্ট নাও।'

কালকের দিনটা অফিসে আসবে না ভেবে রেখেছিল শমিতা। ইচ্ছা করলে তারপরের দিন না এলেও কাউকে জবাবদিহি করতে হতো না। তবু চক্রবর্তী সাহেব নিজের থেকে বলায় সে খুশি হলো।

শমিতা বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে নিজের কামরায় ফিরে আসে সে। গোটা অফিস জুড়ে এখন প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা চলছে।

শমিতা তার রিভলভিং চেয়ারটিতে বসে এক গেলাস জল খেয়ে টেবলের ড্রয়ার থেকে দুটো মোটা ফাইল বার করে। একটায় ওড়িশা, অন্যটায় অসমের সেলস রিপোর্ট রয়েছে। দিয়েছে তারই ডিপার্টমেন্টের দুই জুনিয়র সেলস একজিকিউটিভ। ওদের ঐ দুই স্টেটের সেলসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বম্বে যাবার আগে এই রিপোর্ট দু'টো পেয়েছিল শমিতা কিন্তু তাড়াহুড়োয় তখন ভাল করে দেখা হয়নি। তবে এটুকু লক্ষ করেছিল, আগের বছর প্রথম চার মাসে ঐ স্টেট দুটোতে তাদের প্রোডাক্ট যা বিক্রি হয়েছে, এ বছর সেই একই সময়ে বিক্রি তুলনায় কমে গেছে। লক্ষণটা ভাল নয়।

ঘন্টা দুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রিপোর্ট দুটো পড়ল শমিতা। সেলস নেটওয়ার্কের দুই একজিকিউটিভ রিপোর্টে যা মন্তব্য করেছে তা খুব আশাব্যঞ্জক নয়। কেননা হায়দ্রাবাদের একটা কোম্পানি ঐ দুই স্টেটে ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়েছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, বড় বড় শহরে বিরাট বিরাট হোর্ডিং লাগিয়ে, ফেস্টুন টাঙিয়ে এমন চটকদার ক্যাম্পেন শুরু করেছে যে চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে।

একশ টাকার জিনিস কিনলে লোভনীয় উপহারও দিচ্ছে ওরা। তা ছাড়া সেলসে ওদের লোকজনও প্রচুর। বড় বড় শহরে তো বটেই, ছোট ছোট মফস্বল টাউন, এমনকি গাঁ-গঞ্জেও তারা ছড়িয়ে পড়েছে। তুলনায় তাদের রেনবো ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রচার প্রায় কিছুই হচ্ছে না, সেলসে লোকজনও খুব কম। এখনই লোক বাড়িয়ে ক্যাম্পেন জোরদার না করলে ওড়িশা এবং অসমের বাজার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

রিপোর্ট পড়া যখন শেষ হলো লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। আবদুলকে দিয়ে ক্যানটিন থেকে চিকেন স্যান্ডউইচ, ফিশ ফ্রাই, কিছু সবজি সেদ্ধ, ভেজিটেবল সুপ আর আইসক্রিম আনিয়ে নিল শমিতা। বাইরে ইনভিটেশান না থাকলে লাঞ্চটা নিজের কামরায় বসেই খায় সে।

আবদুল জলের গেলাস এবং খাবারের প্লেটগুলো টেবলে সাজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়। ততক্ষণে অ্যাটাচড্ টয়লেট থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে কামরার বাইরের লাল আলো জ্বালিয়ে দেয় শমিতা। তারপর খেতে শুরু করে। লাঞ্চ ব্রেকের সময় যাতে কেউ চেম্বারে ঢুকে না পড়ে তাই লাল আলো।

লাঞ্চের পর আধ ঘন্টা কোনো কাজই করে না শমিতা, রিভলভিং চেয়ারে পিঠটা হেলিয়ে এই সময়টা বিশ্রাম করে। আজও তার হেরফের হলো না।

ঠিক তিরিশ মিনিট পর বাইরের লাল আলো নিভিয়ে আবদুলকে দিয়ে সেলস ডিপার্টমেন্টের দু'জন একজিকিউটিভকে, যাদের ওপর অসম আর ওড়িশার মার্কেটিং-এর দায়িত্ব রয়েছে, ডাকিয়ে আনে শমিতা। তাদের একজন অভিজিৎ চৌধুরী, দ্বিতীয়জন মলয় সেন। দু'জনেরই বয়স তিরিশের কাছাকাছি, ঝকঝকে স্মার্ট চেহারা। ঘন্টা তিনেক ধরে তাদের সঙ্গে টানা কনফারেন্স করে সে।

ঠিক হয়, ঐ দুটো স্টেটের জন্য সেলসে বেশ কিছু লোক নেওয়া হবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পছন্দমতো ক্যান্ডিডেট বাছাই করতে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ দিন লেগে যাবে। কিন্তু ততদিন দেরি করা যাবে না। তার আগেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ওড়িশার ভুবনেশ্বর কটক রাউরকেলা এবং অসামের গুয়াহাটি জোরহাট আর ডিব্রুগড়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, হোর্ডিং পোস্টার ফেস্টুনে চারদিক ছয়লাপ করে ক্যাম্পেন আরম্ভ করে দিতে হবে এবং সেটা আসছে সপ্তাহ থেকেই। বাজারের যেটুকু হাতছাড়া হয়ে গেছে সেটা ফিরে

পেতেই হবে।

অভিজিৎ বলে, 'ক্যাম্পেন ট্যাম্পেন ঠিক আছে কিন্তু গিফটের ব্যাপারটা ?'

শমিতা বলে, 'গিফট দিতে হবে। হায়াদ্রাবাদের কোম্পানি যা দিচ্ছে তার চেয়ে বেটার কিছু না দিলে চলবে না। যেভাবেই হোক বায়ারদের আমাদের দিকে ফেরাতেই হবে।'

মলয় বলে, 'কী দেওয়া যায় ?'

শমিতা বলে, 'সেটা তোমরা ভেবে ঠিক করে কাল জানিয়ে দিও। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' সে মলয়দের 'তুমি' করে বলে।

কনফারেন্স শেষ হলো পৌনে পাঁচটায়। তারপর নিজের ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে ফেলে শমিতা। অফিস ছুটি হয় পাঁচটায়। খুব জরুরি কারণ না থাকলে তারপর আর অফিসে থাকে না সে।

সাত

এই বেলাশেষে রোদের রং বাসি হলুদের মতো মলিন। আকাশে টুকরো-টাকরা ভবঘুরে মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝিরঝিরে স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে বাতাস।

অফিস ছুটির পর রাস্তায় এখন মানুষ এবং গাড়ির ঢল নেমেছে।

ড্রাইভার রামেশ্বরকে ছুটির পর অন্য কোথাও যাবার কথা না বললে অভ্যাসবশে সে সোজা শমিতাকে ল্যান্সডাউনে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে নিয়ে আসে। আজও একই রুট ধরে সে ড্রাইভ করছিল।

গাড়িটা যখন ক্যামাক স্ট্রিট দিয়ে সার্কুলার রোডের ক্রসিংয়ে চলে এসেছে সেই সময় হঠাৎ পারুলের চিন্তাটা শমিতার মাথার মধ্যে ফিরে এল। অফিসে চক্রবর্তী সাহেবের সঙ্গে মিটিং, অসাম আর ওড়িশার সেলস নিয়ে অভিজিৎ চৌধুরী এবং মলয় সেনের সঙ্গে দীর্ঘ কনফারেন্স ইত্যাদি ব্যাপারে সে এতই মগ্ন ছিল যে পারুলের কথা মনে ছিল না।

পারুলের পরনের সেই শাড়ি-জামা ছাড়া বাড়তি পোশাক কিছুই নেই।

কাল এয়ারপোর্টে সে তার টিনের সুটকেশটা ফেলে এসেছে। আসছে কাল যদি হোমে ওর থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায় জামাকাপড় এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস কিনে দেওয়া দরকার।

শমিতা বলে, 'রামেশ্বর, গাড়িটা ঘুরিয়ে নাও। আমি একবার নিউ মার্কেট যাব।'

রামেশ্বর বলে, 'জি মেমসাব।'

ট্রাফিকের জট ছাড়িয়ে নিউ মার্কেটে পৌঁছুতে প্রায় মিনিট চল্লিশেক লেগে গেল। পারুলের জন্য চারখানা শাড়ি, চারটে ব্লাউজ, চারটে সায়া কিনল শমিতা। সেই সঙ্গে মোটামুটি মাপ আন্দাজ করে কিনল একজোড়া ব্রা, লেডিজ স্লিপার, তোয়ালে, পাউডারের কৌটো, দুটো সাবান, নারকেল তেলের কৌটো, প্রসাধনের ছোটখাটো আরো কিছু জিনিস,' ইত্যাদি।

কেনাকাটা শেষ করে ক্যাশ কাউন্টারে বিলের টাকা জমা দিতে দিতে ঝিলিকের মুখটা মনে পড়ে গেল শমিতার। কাল হোমগুলোতে ঘোরাঘুরির পর সে একবার ওকে দেখতে যাবে। কখনও খালি হাতে যোধপুর পার্কে যায় না শমিতা, ঝিলিকের জন্য হয় দামি কেক, নইলে রঙের বাক্স, জিনসের ট্রাউজার্স, স্মার্ট ইলেকট্রনিক ঘড়ি, টেনিস র‍্যাকেট কিংবা পেন-টেন নিয়ে যায়। নিউ মার্কেটে যখন এসেই পড়েছে, এখান থেকে কিছু একটা কিনে নেবে।

ল্যান্সডাউনে শমিতা যখন তার স্যুইটে ফিরে এল আটটা বেজে গেছে। বাইরে থেকে তালা খুলে ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে ড্রইংরুমের এক কোণে, কার্পেটের ওপর সিঁটিয়ে বসে আছে পারুল। তার মুখ আতঙ্কে নীল, থরথর কাঁপছিল মেয়েটা।

শমিতাকে দেখে দৌড়ে এসে তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে পারুল। তাকে একটা সোফায় বসিয়ে, নিজে পাশে বসে উদ্বিগ্ন সুরে শমিতা জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে?'

সন্ত্রস্ত, কাঁপা গলায় পারুল বলে, 'ওরা-ওরা—' কথাটা শেষ করতে পারে না সে।

'কাদের কথা বলছ?'

'ঐ যারা আমারে নে যাচ্ছিল, আপনি যাদের হাত থিকে আমারে বাঁচায়ে আনলেন।'

শমিতা চমকে উঠে বলে, 'ওরা এখানে এসেছিল নাকি ?'

মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে পারুল।

শমিতা বলে, 'কী হয়েছিল আমাকে সব বল।'

পারুল থেমে থেমে ভয়ার্ত স্বরে যা বলে তা এইরকম। সকালে শমিতা অফিসে বেরিয়ে যাবার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকে সে, তারপর স্নান-টান করে খেয়ে নেয়। খাওয়া হলে প্লেট ধুয়ে যখন গুছিয়ে রাখছে, টেলিফোনটা একটানা অনেকক্ষণ বেজে যায়।

শমিতা বলে, 'তুমি ফোন ধরেছিলে নাকি ?'

পারুল বলে, 'আমি কি ঐ যন্তরে (ফোনে) কথা কইতে জানি ? জম্মে এই তো পেত্থম দেকলাম। ওটা আমি উঠোই নি।'

'তারপর কী হলো বল—'

পারুল জানায়, বহুবার বাজার পর একসময় ফোনটা একেবারে চুপচাপ হয়ে যায়। সে ভেবেছিল, একা একা কী আর করবে, দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া ভাল, বিকেলে মেমসাহেব অর্থাৎ শমিতা তো ফিরেই আসবেন।

কিন্তু ফাঁকা ফ্ল্যাটে ঘুম আসছিল না পারুলের, ভয়ে গা ছমছম করছিল। এভাবে একা একা থাকার অভ্যাস তো তার কোনোকালেই নেই। খানিকক্ষণ এঘরে ওঘরে ঘোরাঘুরি করার পর রাস্তার দিকের জানালার পাশে গিয়ে বসেছিল সে। যাট সত্তর ফিট নিচে ল্যান্সডাউন রোডে প্রচুর লোকজন আছে, গাড়ির স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এসব দেখে ভয়টা অনেক কমে এসেছিল। কিন্তু হঠাৎ তার চোখে পড়ে উল্টোদিকের ফুটপাথে সেই লোকটা মানে গণপতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বাড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ওকে দেখামাত্র আতঙ্কে বুকের ধুকপুকুনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার, কোনোরকমে শরীরটাকে টেনে হেঁচড়ে জানালার কাছ থেকে ড্রইংরুমের মাঝখানে নিয়ে এসেছিল।

রুদ্ধশ্বাসে শমিতা জিজ্ঞেস করে, 'তারপর ?'

পারুল বলে, 'আমি ভাবলম বুঝিন ঢ্যামনাটা আমারে দেখতে পায়নি। কিন্তুন খানিকক্ষণ পর দরজায় খটর খটর আওয়াজ হলো আর আমার নাম ধইরে বজ্জাতটা গলা নাম্যে (নামিয়ে) ডাকতে লেগেছিল।'

শমিতা শিউরে ওঠে, 'বল কী !'

'হ্যাঁ মেমসাহেব, সত্যি কইচি।'

'স্কাউন্ড্রেলটা এই বাড়ির ভেতর পর্যন্ত চলে এসেছিল !'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে রাস্তা থেকে লোকটা তোমাকে দেখতে পেয়েছিল।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। অনেক বার ডাকাডাকি করে সে চইলে গেল। আমি একবারও সাড়া দিই নাই।'

'খুব ভাল করেছ।'.

'আমার সাড়া না পেয়ে লোকটা শাসিয়ে গেল, এবের য্যাখন আসবে আমার চুলের ঝুঁটি ধরে নে যাবে। কী ভয় যে লাগল কয়ে বুঝোতে পারব নি। আপনি য্যাতক্ষণ না এলেন বুকির (বুকের) ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। সে কী কাঁপুনি !'

শমিতা ভাবে সে নিজেই যদি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, পারুলের আতঙ্ক কাটবে না। মেয়েটাকে সাহস দেবার জন্য বলে, 'কোনো ভয় নেই। এখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া এত সহজ নয় পারুল। ওর ভাগ্য ভাল আমি তখন ফ্ল্যাটে ছিলাম না।'

কী চিন্তা করে পারুল বলে, 'কিন্তুন—'

'কী ?'

'সারাক্ষণ তো আপনি আমারে পাহারা দে বসে থাকতি পারবেন না।'

কথাটা ঠিকই বলেছে পারুল। শমিতা উত্তর দেয় না।

পারুল আবার বলে, 'আপনি য্যাখন বাইরে বেরুবেন, লোকটা তো ফের আসবে বুলে গেল। ত্যাখন ?'

হোমের কথা মনে পড়ে যায় শমিতার। সে বলে, 'চিন্তা করো না। কাল পরশু আমি অফিসে যাচ্ছি না। এর ভেতর তোমার জন্যে এমন ব্যবস্থা করব যাতে ওরা তোমার ধারে-কাছে ঘেঁষতে না পারে।'

'কী ব্যবোস্তা করবেন ?'

'পরে শুনো।'

সাহস দিলেও পারুলের দুশ্চিন্তা এবং ভয় যে কাটেনি সেটা বোঝা যাচ্ছিল। তার মন অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য শমিতা বলে, 'তোমার জন্যে কী এনেছি দেখ—'

উৎসুক চোখে শমিতার দিকে তাকায় পারুল।

শমিতা জামা-কাপড়ের প্যাকেটগুলো খুলে শাড়ি-টাড়ি বার করে বলে, 'এগুলো তোমার।'

খুশিতে, বিস্ময়ে দু-চোখ চকচক করতে থাকে পারুলের। বলে, 'সব আমার !'

ষোল-সতের বছর বয়স হলেও এখনও পারুলের মধ্যে শিশুর মতো আশ্চর্য এক সারল্য রয়েছে। একসঙ্গে এত নতুন জামা-কাপড় জীবনে এর আগে কখনও সে পায়নি। গণপতির মতো মারাত্মক সব লোকেরা ছায়ার মতো তার পেছনে লেগে আছে, এই মুহূর্তে সে সব যেন ভুলে গেল সে। শাড়ি জামা জুতো, এইসব নিয়ে আনন্দে পারুল কী যে করবে, ভেবে উঠতে পারছে না।

শমিতা বলে, 'সব তোমার। পছন্দ হয়েছে তো ?'

'খুব।'

'সেই দুপুরবেলা খেয়েছ, নিশ্চয়ই এখন ভীষণ খিদে পেয়েছে ?'

লাজুক মুখে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে পারুল, 'না না, ত্যামন এট্টা পায়নি।'

তার নাকে আলতো করে টোকা মেরে শমিতা বলে, 'বোকা মেয়ে, খাওয়ার ব্যাপারে লজ্জা করতে নেই। চল, রান্নাটা সেরে ফেলি। রাত্তিরে কী খাবে বল—'

মুখ নামিয়ে পারুল বলে, 'আমি কী কইব ! আপনার যা মন হবে।'

শমিতা মনে মনে ভাবে, কাল কথাবার্তা যদি ঠিক হয়ে যায় পারুল হোমে চলে যাবে। তার আগে ওকে যত্ন করে খাওয়ানো যাক।

দু'জনে ভাগাভাগি করে একসময় ডিনার তৈরি করে ফেলে। পরোটা, মাংস, ডিমের কারি এবং আলুভাজা। সেই সঙ্গে ওবেলার মাছও রয়েছে।

দশটা বাজলে শমিতারা খেতে বসে যায়। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খাওয়া চলে। খেতে খেতেই চোখের কোণ দিয়ে কয়েক বার পারুলকে লক্ষ করে শমিতা। প্লেটের ওপর অনেকখানি ঝুঁকে মেয়েটা ভারি নিবিষ্ট হয়ে খাচ্ছে। এমন সুখাদ্য জীবনে বোধহয় আগে আর জোটে নি। বড় মায়া হলো তার জন্য। কিন্তু হোমের কথাটা পারুলকে বলতেই হবে। মনে মনে সেখানে যাবার

জন্য তার প্রস্তুত হওয়া দরকার।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ, শমিতা আস্তে করে ডাকে, 'পারুল।'

পারুল মুখ তোলে।

শমিতা বলে, 'তোমার সঙ্গে ভীষণ দরকারি একটা কথা আছে। মন দিয়ে শোন।'

পারুল উৎসুক চোখে তাকায়, জিজ্ঞেস করে, 'কী ?'

'তুমি তো এখানকার অবস্থা দেখছ। একা একা থাকি, কোথাও বেরুতে হলে দরজায় তালা লাগিয়ে যেতে হয়। তোমাকে তো এভাবে বন্ধ ঘরে রোজ রোজ রেখে যাওয়া যায় না। কখন কী বিপদ ঘটে যাবে ! ঐ বদমাশ লোকটা তোমার ওপর নজর রেখেছে। সুযোগ পেলেই ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে।'

'না না, আমি আর কখুনও জানলার ধারে বসব না। ওরা আমারে দেকতে না পেলি তো ভয় লেই।'

শমিতা বলে, 'একবার যখন লোকটা টের পেয়ে গেছে তুমি এখানে আছ, জানলার কাছে না বসলেও ঠিক এসে হাজির হবে।'

পারুল বলে, 'এলেও বাইরে থিকে যতই ডাকুক আর দরজা ধাক্কাক আমি সাড়া দুবো (দেবো) না। আপনি তো ত্যাখন বুললেন এখেন থিকে আমারে টেনে নে যাওয়া সোজা লয়। আর যদিন—'

'কী ?'

'যদিন ঝামেলা করতে চায়, চিল্লিয়ে-মিল্লিয়ে লোকজন জড়ো করে ফেলব। মারের চোটে ওদের হাড় ভেঙে দেবে।'

বোঝা যাচ্ছে, এই স্যুইট ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইছে না পারুল। হয়তো ভাবছে গণপতিরা হানা দিলেও সে এখানে সবচেয়ে বেশি নিরাপদ, সবচেয়ে সুরক্ষিত। তা ছাড়া যে মমতা এবং সহানুভূতি শমিতার কাছে পেয়েছে সেসব অন্য কোথাও পাবে না।

শমিতা বলে, 'আরো একটা কথা আছে।'

'কী ?'

'আমি সব সময় কলকাতায় থাকি না। মাসের ভেতর বার চোদ্দ দিন কি তারও বেশি দিল্লি বম্বে কি অন্য জায়গায় অফিসের কাজে ঘুরে বেড়াতে হয়। তখন তো খুবই সমস্যা। কোথায় রেখে যাব তোমাকে ? কে তোমাকে

পাহারা দেবে ? একটা কিছু ঘটে গেলে—' বলতে বলতে থেমে যায় শমিতা।

এক মুহূর্তও না ভেবে পারুল বলে, 'আমারে আপনার সঙ্গে নে যাবেন। আমি আপনার সব কাজ করে দুবো—কাপড়কাচা, রান্নাবাড়া, চা করা—সমস্ত।'

শমিতা বলে, 'ঐ সব জায়গায় অন্য কাউকে নিয়ে যাওয়া যায় না।'

এবার হতাশ দেখায় পারুলকে। সে বলে, 'তা হলে ?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় না শমিতা। বেশ খানিকক্ষণ পরে খুব কোমল গলায় বলে, 'তোমার জন্যে এক জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করছি।'

পারুল চমকে ওঠে। বলে, 'কুথায় ?'

'গেলেই জানতে পারবে। খুব ভাল জায়গা। তোমার কোনোরকম অসুবিধে হবে না।' শমিতা বলতে থাকে, 'আর আমি দু-একদিন পর পর গিয়ে তোমাকে দেখে আসব।'

মুখটা করুণ দেখায় পারুলের। কাঁপা গলায় বলে, 'কিন্তুন—'

শমিতা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'যদি দেখি ঐ জায়গায় থাকতে কষ্ট হচ্ছে, আমার কাছে তোমাকে নিয়ে আসব।'

দু' চোখ জলে ভরে যাচ্ছিল পারুলের। একটি কথাও আর বলে না সে। এ বাড়িতে থাকা হবে না জানার পর শমিতা কোথায় তাকে নিয়ে যাবে, সে সম্বন্ধে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে পারুল। আস্তে আস্তে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বসে থাকে।

পারুলকে দেখতে দেখতে মন খারাপ হয়ে যায় শমিতার। এই দু'দিনে মেয়েটার ওপর কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। কিন্তু ওকে যে কাছে রাখবে তারও তো উপায় নেই। নিজের জীবনটাই তার এলোমেলো, বিশৃঙ্খল। নতুন করে সমস্যা বাড়িয়ে কী লাভ ?'

শমিতা একসময় পারুলকে বলে, 'অনেক রাত হয়েছে। এবার শুতে যাও। কাল তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।'

আট

পরদিন সকালে মায়া কাজ করে যাবার পর স্নান, রান্না এবং খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফেলে শমিতারা। কাল পারুলের জন্য যে শাড়ি-টাড়ি কেনা হয়েছিল সেগুলো একটা নতুন সুটকেসে পুরে দু'জনে যখন বেরিয়ে পড়ে তখন ন'টাও বাজেনি।

অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে চেতলায় অহীন্দ্র মঞ্চের পেছন দিকে সুরজিৎদের পুরনো আমলের দোতলা বাড়িটা খুঁজে বার করতে মিনিট পনেরর বেশি লাগল না।

সুরজিৎ স্নান-টান সেরে ফিটফাট হয়ে অপেক্ষা করছিল। শমিতা ট্যাক্সি থেকে নেমে গিয়ে বলে, 'বাঃ, রেডি হয়ে আছেন দেখছি। চলুন—'

সুরজিৎ বলে, 'যাব তো নিশ্চয়ই। একটু বসুন। এক কাপ চা অন্তত খান।'

'চা পাওনা রইল। আরেক দিন এসে দশ কাপ খেয়ে যাব।'

একরকম তাড়া দিয়েই সুরজিৎকে ট্যাক্সিতে নিয়ে তোলে শমিতা।

প্রথমে ওরা যশোর রোডের একটা 'হোম'-এ আসে। সামনের দিকের লোহার গেটের পর একতলা একটা ছোট বাড়ি, সেখানেই অফিস। তারপর খানিকটা ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে জরাজীর্ণ তেতলা হোমটা ঘিরে ভাঙাচোরা বাউন্ডারি ওয়াল।

অফিসে বিপুল চেহারার কুচকুচে কালো একটি মহিলা—পরনে সাদা ধবধবে শাড়ি এবং ব্লাউজ, কাঁধে পুরনো ধাঁচের ব্রোচ, ঠোঁটে রং, চুল চুড়ো করে বেঁধে প্রচুর রুপোর কাঁটা দিয়ে আটকানো, বাঁ হাতে চওড়া স্টিল ব্যান্ডে আটকানো জেন্টস রিস্ট-ওয়াচ—প্রকাণ্ড একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। সামনের টেবলে একটা কাঠের ছোট ব্লকে লেখা আছে ঃ মিস চন্দ্রপ্রভা মল্লিক, সুপারিনটেনডেন্ট।

পারুলকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে শমিতা আর সুরজিৎ অফিসে এসে মিস চন্দ্রপ্রভা মল্লিককে নিজেদের পরিচয় দিয়ে এখানে আসার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে

দেয়।

চন্দ্রপ্রভার যেমন চেহারাই হোক, কণ্ঠস্বরটি সুরেলা, অনেকটা সেতারের ঝংকারের মতো। বললেন, 'আপনাদের সমস্যাটা বুঝতে পারছি কিন্তু আমি সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না।' বলে ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগলেন।

শমিতা এবং সুরজিৎ চকিত হয়ে ওঠে। চন্দ্রপ্রভা সোজাসুজি এভাবে বলবেন, তারা ভাবতে পারে নি। শমিতা মিনতির সুরেই প্রায় বলে, 'খুব আশা করে এসেছিলাম। দেখুন না, কোনোভাবে একটা ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা—'

সুরজিৎ বলে, 'আপনি একটু অনুগ্রহ করলেই—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে চন্দ্রপ্রভা বলেন, 'আমার হাত-পা বাঁধা। কিচ্ছু করার উপায় নেই। গভর্নিং বডি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নতুন কোনো মেয়েকে নেওয়া হবে না।'

সুরজিতের ভেতরকার সাংবাদিকটি তৎপর হয়ে ওঠে। সে জিজ্ঞেস করে, 'কারণটা কী ?'

'খুব সিম্পল। গভর্নমেন্টের গ্র্যান্ট আমরা খুব কমই পাই। প্রাইভেট ডোনেশানের ওপর প্রায় সমস্তটাই নির্ভর করতে হয় কিন্তু সে সব সময়মতো আসে না। পুরনো মেয়ে যারা আছে তাদেরই ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তার ওপর মেয়ে নেওয়া মানে আরো সমস্যা। তাই—'

'টাকার জন্যে ভাববেন না। আমরা যে মেয়েটিকে এখানে রাখতে চাই তার সব খরচ আমরাই দেব। ওর জন্যে আপনাদের আর্থিক দিক থেকে কোনোরকম বার্ডেন নিতে হবে না। আপনারা ওকে দয়া করে শেলটার দিন। আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

চন্দ্রপ্রভা একটু চিন্তা করে বলেন, 'টাকা না হয় দিলেন কিন্তু এখানে অন্য প্রবলেমও রয়েছে।'

'কিরকম ?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় সুরজিৎ।

চন্দ্রপ্রভা বলেন, 'ঐ দিকে দেখুন—' বলে আঙুল বাড়িয়ে বাউন্ডারি ওয়াল দেখিয়ে দেন।

বিমূঢ়ের মতো শমিতা আর সুরজিৎ চন্দ্রপ্রভার কথামতো তাকায়।

চন্দ্রপ্রভা জিজ্ঞেস করেন, 'কী দেখলেন ?'

'ভাঙা দেওয়াল।'

'রাইট। টাকার অভাবে বাউন্ডারি ওয়ালটা উঁচু করে বসানো যাচ্ছে না। এদিকে দিন দিন অ্যান্টি-সোশালদের ঝামেলা বেড়েই যাচ্ছে। জানেন ওরা কী করে ?'

বিমূঢ়ের মতো শমিতা আর সুরজিৎ মাথা নাড়ে।

চন্দ্রপ্রভা টেবলের ওপর দিয়ে অনেকটা ঝুঁকে গলা নামিয়ে বলেন, 'রাতে প্রায়ই ভাঙা দেওয়ালের ফোকর গলে ওরা ভেতরে ঢুকে হামলা চালায়। সব সময় আমরা ভয়ে ভয়ে থাকি। কখন যে কী বিপদ ঘটে যাবে কে জানে।'

শমিতা চমকে ওঠে, 'কেন, সিকিউরিটির ব্যবস্থা নেই ?'

চন্দ্রপ্রভা বলেন, 'এতবড় হোমের জন্যে মোটে দু'জন। টাকার অভাবে গার্ডও বাড়ানো যাচ্ছে না। বুঝতেই পারছেন নতুন মেয়ে নেওয়া মানেই আরো টেনশান। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।'

এরপর আর অনুরোধ করার মানে হয় না।

অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে হতাশ সুরে শমিতা বলে, 'এবার ?'

তাকে ভরসা দিয়ে সুরজিৎ বলে, 'মেয়েদের হোম কি এই একটাই ? চলুন, বেলেঘাটায় গিয়ে একবার দেখা যাক।'

দ্বিতীয় হোমটা বেলেঘাটা ছাড়িয়ে পুব দিকে খানিকটা এগিয়ে কোণাচে একটা রাস্তায়। এটা চারতলা পুরনো একটা বাড়ি, প্রথমটার মতো জরাজীর্ণ নয়। প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে গোটা কমপাউন্ডটা ঘেরা। সামনের দিকে মজবুত লোহার গেট। সব মিলিয়ে একটা দুর্গের মতো।

গেট থেকে খানিকটা দূরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েছিল শমিতারা। এক পলক দেখেই তারা আশান্বিত হয়ে ওঠে, এখানে অন্তত পারুলের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে না।

প্রথম হোমটার মতো এখানেও পারুলকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে সুরজিৎকে সঙ্গে করে শমিতা সবে রাস্তায় নেমেছে, কোত্থেকে একটা মাঝবয়সী ক্ষয়াটে চেহারার লোক—পরনে আধময়লা ধুতি আর হাফশার্ট, নাকের তলায় পাতলা গোঁফ, মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি, বড় সাইজের সুপুরির মতো কণ্ঠমণি—গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়। এধারে ওধারে তাকিয়ে ষড়যন্ত্রকারীর মতো

ফিসফিসিয়ে বলে, 'আপনারা কি হোমে কোনো দরকারে এসেছেন ?'

লোকটার চাউনি, কথা বলার ভঙ্গি, সব কেমন যেন সন্দেহজনক। শমিতা রীতিমতো অবাক হয়ে বলে, 'হ্যাঁ। কেন বলুন তো ?'

লোকটা বলে, 'এখানে দাঁড়িয়ে এ সব আলোচনা ঠিক নয়। এদিকে আসুন।'

'ওদিকে যাব কেন ?'

'আসুনই না আমার সঙ্গে। কোনো ভয় নেই।'

অচেনা, উটকো একটা লোকের কথায় যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা শমিতা যখন বুঝে উঠতে পারছে না সেই সময় তুখোড় থট-রিডারের মতো সে বলে ওঠে, 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, আমার কোনোরকম বদ মতলব নেই।' একটু থেমে ফের বলে, 'মনে করুন, আমি আপনাদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।'

নিজের সম্বন্ধে লোকটার এত বড় ঘোষণা সত্ত্বেও দ্বিধা কাটে না শমিতাদের। তারা ইতস্তত করতে থাকে।

লোকটা এবার বলে, 'আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলে হয়তো দু-একটা পরামর্শ দেব। পছন্দ না হলে সেগুলো এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বার করে দেবেন।' একরকম জোর করেই সে খানিকটা দূরে একটা বাড়ির আড়ালে শমিতাদের নিয়ে যেতে যেতে বলে, 'আপনারা হয়তো ভাবছেন আমি জবরদস্তি করছি কিন্তু সব শুনলে বুঝতে পারবেন এটার দরকার ছিল।'

শমিতা বিস্ময়ের ঘোর খানিকটা কাটিয়ে উঠে বলে, 'যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

লোকটি বলে, 'প্রথমে নিজের পরিচয় দিই। আমার নাম অবিনাশ পালচৌধুরী, এই পাড়ারই বাসিন্দা, রিসেন্টলি এ জি বেঙ্গল থেকে রিটায়ার করেছি। সে যাক, আপনাদের আগে কখনও এখানে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।'

শমিতা বলে, 'আগে কখনও এ রাস্তায় আসিনি বলে। এখানে যারা আসে তাদের ওপর আপনি নজর রাখেন নাকি ?'

শমিতার প্রশ্নটার মধ্যে একটু খোঁচা ছিল, অবিনাশ তা গায়ে মাখে না। বলে, 'হ্যাঁ। নজরটা তাদের উপকারের জন্যেই রাখতে হয়।'

'কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় শমিতা।

'এখানে লোকের কাছে খোঁজ নিতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে।'

'এখানকার ব্যাপারে আমি আর ইন্টারেস্টেড নই।'

সুরজিৎ একটু ভেবে বলে, 'টালিগঞ্জে একটা হোম আছে। সেখানে খোঁজ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আজই যাবেন ?'

শমিতা বলে, 'কেন বলুন তো ? আপনার কোনো অসুবিধে আছে ?'

ব্যস্তভাবে সুরজিৎ বলে, 'না না, আমার আবার অসুবিধে কী ? বিকেলে অফিস গেলেই হবে। আপনার কথাই ভাবছিলাম। সেই সকাল থেকে ঘুরছেন—'

শমিতা বলে, 'বেরিয়ে যখন পড়েছি, আজই যা হোক একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে চাই।'

টালিগঞ্জে গিয়েও কাজের কাজ কিছু হলো না। জানা গেল, এখানকার হোমটা আর চালানো হবে না। আবাসিক মেয়েদের এক এক করে অন্য হোমগুলোতে পাঠানো হচ্ছে। বাকি যে দশ-বার জন এখনও এখানে আছে, তাদের দু-এক মাসের ভেতর অন্য জায়গায় সরানো হবে।

কাজেই হতাশ শমিতা বলে, 'আর কোনো হোম আপনার জানা আছে ?'

সুরজিৎ দ্রুত একবার পারুলকে দেখে নিল। আগাগোড়া সে লক্ষ করেছে, এতগুলো হোমে ছোটাছুটি করা হলো কিন্তু মেয়েটা একটা কথাও বলেনি, সারাক্ষণ রক্তশূন্য, বিষণ্ণ মুখ তার। যেন নিজের ভাগ্য কোনো দুর্জ্ঞেয় নিয়তির ওপর সঁপে দিয়ে সে শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে আছে।

সুরজিৎ পারুলের দিকে চোখ রেখেই শমিতাকে বলে, 'যতক্ষণ না কোনো শেলটারের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে, পারুল আপনার কাছেই থাক।'

তার কথা শেষ হতে-না-হতেই চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পারুলের, তার মুখে খুশির আভা চিকচিক করতে থাকে।

শমিতা অন্যমনস্কের মতো বলে, 'তা ছাড়া আর উপায় কী ?'

সুরজিৎ বলে, 'এবার বাড়ি ফিরবেন তো ?'

হঠাৎ শমিতার মনে পড়ে গেল, স্যুইট থেকে বেরুবার সময় পারুলের সুটকেসে তার জামাকাপড়ের সঙ্গে ঝিলিকের জন্য কেনা নতুন পোশাকের

প্যাকেটটাও পুরে নিয়েছিল। ভেবেছিল, কোনো হোমে পারুলকে রেখে সে যোধপুর পার্কে গিয়ে ঝিলিককে দিয়ে আসবে। অনেক দিন মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়নি, সে জন্য মনটা অস্থির হয়ে আছে। ঝিলিক যে স্কুলে পড়ে সেখানে বৃহস্পতিবার ছুটি থাকে। আজ বৃহস্পতিবার। ঝিলিক বাড়িতেই থাকবে।

শমিতা বলে, 'একবার যোধপুর পার্কে যেতে হবে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরব।'

'কতক্ষণ থাকবেন ওখানে?'

'ম্যাক্সিমাম হাফ-অ্যান-আওয়ার।'

ঘড়ি দেখে সুরজিৎ বলে, 'এখন তিনটে বেজে পঁচিশ। যোধপুর হয়ে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সোয়া চারটে সাড়ে চারটের ভেতর অফিসে হাজিরা দিতে পারব।'

শমিতা বলে, 'চলুন তাহলে।'

টালিগঞ্জের হোমটা নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা যাবার পর ডান দিকের নিরিবিলি একটা গলিতে। সেখান থেকে বেরিয়ে শমিতাদের ট্যাক্সি প্রথমে আসে মেট্রো স্টেশন। ট্রাম ডিপো, টালিগঞ্জ ক্লাব পেছনে ফেলে আনোয়ার শা রোডে যখন ঢোকে সেই সময় শমিতা বলে, 'আপনি এসে ভালই হয়েছে। পারুল যখন আমার কাছে এখন থেকেই যাচ্ছে, পুলিশ প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

সুরজিৎ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বলে, 'হ্যাঁ। আপনাকে তো ঘরে বসে থাকলে চলবে না, অফিস-টফিসে বেরুতে হবে। তখন পারুলের যাতে ক্ষতি না হয় সেটা দেখা দরকার।'

'আমি তো পুলিশকে বলবই। আপনাকেও বলতে হবে। খবরের কাগজের লোকেদের সব জায়গায় খুব খাতির। আপনি বললে পুলিশ বেশি ইমপর্টান্স দেবে।'

'কতটা ইমপর্টান্স দেবে জানি না। তবে আমি আজই বলব। লালবাজারে আমার দু'চারজন চেনা-জানা অফিসার আছেন। এরকম একটা কেস শুনলে নিশ্চয়ই ওঁরা ব্যবস্থা করবেন।'

শমিতা জিজ্ঞেস করে, 'লালবাজারে তো একবার যাওয়া দরকার।'

সুরজিৎ বলে, 'নিশ্চয়ই।'

'কবে যাবেন বলুন।'

'দেরি করা ঠিক হবে না। কালই চলুন।'

'বেশ। কখন যেতে চান ?'

'দুপুরের দিকে।'

'আমি কাল অফিসে যাচ্ছি না। আপনি কি আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন, না, আমি আপনার বাড়ি গিয়ে আপনাকে তুলে নেবো ?'

'কাল সকালে ফোনে জানিয়ে দেবো।'

নয়

যোধপুর পার্কের ঝিলের ধারে শমিতার শ্বশুরবাড়ি 'প্রান্তিক'। ঝকঝকে বাড়িটার সামনের দিকে বাগান, চারপাশ ঘিরে উঁচু কমপাউন্ড ওয়াল। বাগানটায় যত্ন এবং পরিচর্যার ছাপ স্পষ্ট। নানা ধরনের দেশি বিদেশি ফুল ফুটে আছে সেখানে। আর আছে বট, ঝাউ, দেবদারু এমনি বেশ কিছু গাছের বনসাই।

গেটের সামনে এসে ট্যাক্সিটা থামে। সুরজিৎদের বসতে বলে পাবুলের সুটকেস থেকে ঝিলিকের পোশাকের প্যাকেটটা বার করে নিয়ে নেমে পড়ে শমিতা।

গেটের ডান পাশে কাঠের ছোট শেডের তলায় একটা টুলে দারোয়ান রাজু সিং বসে ছিল। মধ্যবয়সী রাজপুত রাজুর জবরদস্ত চেহারা, চওড়া জুলপি দুই গাল বেয়ে নেমে মোটা গোঁফের সঙ্গে মিশেছে। মাথায় পাগড়ি, পায়ে ভারি বুট, পরনে ইস্তিরি-করা খাকি উর্দি।

বেশ কয়েকটা বছর এ বাড়িতে কাটিয়ে গেছে শমিতা। দীর্ঘকালের অভ্যাসে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে রাজু বলে, 'নমস্তে ভাবীজি, আইয়ে আইয়ে—'

শমিতা গেটের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'ভাল আছ তো ?'

'জি। আপকা কিরপা—'

বাগান পেরিয়ে একতলায় ঢুকতেই ছায়াকে দেখতে পায় শমিতা। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে ছায়ার। পুরুষালী ধরনের শক্ত চেহারা। হাত-পায়ের হাড় মোটা মোটা, ভারি চোয়াল, মাথায় চুল কম, উঁচু কপাল, ট্যারাবাঁকা দাঁতে গুঁড়ো তামাকের ছোপ। ডিভোর্সের আগে শমিতার সব কাজকর্ম সে-ই করত। তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদে যারা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে, ছায়া তাদের একজন। এখন তো আর এ বাড়িতে থাকা হয় না, কিন্তু যখনই শমিতা আসে কী খুশি যে সে হয়! আজও তার চোখেমুখে আনন্দের ঝলক খেলে যায়। বলে, ‘বৌদি, কখন এলে?’

শমিতা বলে, ‘এই তো।’

‘এবার অনেক দিন পর তোমাকে দেখলাম।’

‘হ্যাঁ। অফিসের কাজে মাঝে মাঝেই বাইরে থাকতে হচ্ছিল, তাই আসতে [illegible]ম না। তোমরা ভাল আছ তো?’

‘ভাল আর থাকতে পারছি কোথায়?’ মুখের চেহারা একেবারে বদলে যায় ছায়ার।

‘কেন, কী হল?’ জিজ্ঞাসু চোখে ছায়ার দিকে তাকায় শমিতা।

চারপাশ দ্রুত একবার দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে ছায়া বলে, ‘এঘরে এস। কেউ আবার শুনে ফেলবে।’

ছায়ার সঙ্গে একতলার ড্রইংরুমে চলে যায় শমিতা, কোনো প্রশ্ন করে না। কেননা সে জানে ছায়া এবার তোড়ে অনেক কিছু বলে যাবে, তার পেটে কথা থাকে না।

ছায়া বলে, ‘তুমি কি খবর পেয়েচ, দাদাবাবুর ফের বিয়ের জন্যি সব্বাই উঠে পড়ে লেগেচে?’

বিপাশার কাছে আগেই খবরটা পাওয়া গিয়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে শমিতা। তারপর গম্ভীর গলায় বলে, ‘ওসব কথা থাক।’

এই আধা-যুবতী মেয়েমানুষটি যে তার খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী, সেটা শমিতার অজানা নেই। কিন্তু তার এ জাতীয় কথাবার্তা, বিশেষ করে এ বাড়িতে, ভীষণ অস্বস্তিকর। শ্বশুর-শাশুড়ির কানে গেলে হয়তো ভাববেন, এখানে ফেরার জন্য সে প্রচণ্ড আগ্রহী, তাই ছায়ার সঙ্গে পরামর্শ করছে। তা ছাড়া বুচিরও প্রশ্ন আছে। একটি কাজের মেয়ের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনার কথা সে ভাবতে

পারে না। প্রসঙ্গটা থামাবার জন্য বলে, 'ঝিলিক বাড়ি আছে?'

'আছে।'

'ওকে খবর দাও—'

'তুমি ওপরে যাও না—'

'তুমি তো জানো, আমি ওপরে যাই না। ওঁরা তা পছন্দ করবেন না।'

'বৌদি, অত গোঁ ধরে থাকলে কী চলে? শান্তির জন্যি, সুখের জন্যি কখনও কখনও মাথা নোয়ালে ক্ষেতি হয় না।' ছায়া বলতে থাকে, 'যাও না বৌদি—'

ছায়ার ব্যাকুলতার পেছনে ওর কোনোরকম স্বার্থ নেই। তবু হঠাৎ রেগে যায় শমিতা। একতরফা সে মাথা নিচু করবে না। ছেলের বিয়ে ঠিক করতে যাচ্ছে, তা কি ওরা একবারও জানিয়েছে? এখানে এলে কক্ষণো সে দোতলায় ওঠে না। নিচের তলার ড্রইংরুমে বসে ঝিলিকের সঙ্গে দেখা করে চলে যায়। হঠাৎ করে আজ যদি ওপরে ওঠে, ওরা নিশ্চয়ই ভাববে বিয়ের খবর পেয়ে সে হাতে-পায়ে ধরে মিটিয়ে নিতে এসেছে। অতটা নামা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

শমিতা কিছুটা রুক্ষ সুরে বলে, 'তুমি ঝিলিককে নিয়ে এস। আমি ওপরে যাচ্ছি না।'

তার বলার ভঙ্গিতে এমন এক কঠোরতা ছিল যাতে চমকে ওঠে ছায়া। শশব্যস্তে বলে, 'এক্ষুণি ঝিলিককে নিয়ে আসচি।' বলে একরকম দৌড়েই বাইরে বেরিয়ে যায়।

একটা সোফায় চুপচাপ বসে পড়ে শমিতা। ক'বছর আগেও এটাই ছিল তার বাড়ি, একান্ত নিজস্ব। আজ সে এখানকার কেউ না, পরের চাইতেও পর। পারস্পরিক সম্পর্কটা এমনই তিক্ত যে এ বাড়ির কাউকে সে সহ্য করতে পারে না, তার সম্বন্ধে এদেরও তীব্র বিদ্বেষ। যত ভাবছিল, সর্বগ্রাসী অবসাদ এবং নৈরাশ্য যেন চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরছিল।

কতক্ষণ বসে ছিল খেয়াল নেই, পায়ের শব্দে শমিতা দরজার দিকে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে চকিত হয়ে ওঠে। ঝিলিক না, তার প্রাক্তন শাশুড়ি মৃণালিনী ড্রইংরুমে এসেছেন। ছায়াকে ধারে-কাছে কোথাও দেখা গেল না।

ভদ্রমহিলার মধ্যে প্রবল এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে। ধীরে ধীরে নিজের

অজান্তেই উঠে দাঁড়ায় শমিতা। শুধু চকিতই না, রীতিমত অবাকই হয়ে যায় সে। কেননা এখানে এলে কখনই মৃণালিনী নিচে এসে তার সঙ্গে দেখা করেন না।

মৃণালিনী আবেগহীন, ভারি গলায় বলেন, 'তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে।'

শমিতা লক্ষ করল মৃণালিনী তাকে বসতে বললেন না, নিজেও বসলেন না। অগত্যা সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রতীক্ষা করতে থাকে। ভেতরে ভেতরে সামান্য উদ্বিগ্নও হয়। বিবাহবিচ্ছেদের পর ক'বছর সে এ বাড়িতে আসছে, বেশির ভাগ সময় মৃণালিনীর সঙ্গে দেখা হয় না। হলেও কোনোদিন একটি কথাও বলেন না। ঘৃণা এবং উপেক্ষা ছাড়া মহিলাটির কাছে আর কিছুই পায়নি সে। হঠাৎ এতদিন পর তার সঙ্গে ওঁর কী এমন জরুরি কথা থাকতে পারে?

মৃণালিনী কোনোরকম ভণিতা না করে বলেন, 'তুমি হয়তো শুনেছ, খোকনকে আমরা বিয়ে দিচ্ছি।' অরূপের ডাকনাম খোকন।

শমিতাও স্পষ্ট ভাষায় জানালো, 'শুনেছি।'

'আমি চাই না, তুমি আর এ বাড়িতে আসো। নতুন বৌ এসে তোমাকে দেখলে জটিলতা বাড়বে। তোমাকে এ বাড়িতে আনার পর অনেক তিক্ততা হয়ে গেছে। আমি চাই না তোমার জন্যে নতুন করে সমস্যা তৈরি হোক।' মৃণালিনী একটানা বলে যান, 'আশা করি, আমার কথাটা তুমি বুঝতে পেরেছ। আমি চাই এ নিয়ে তুমি অশান্তি করবে না।'

মৃণালিনী কী চান আর কী চান না, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। শমিতার মাথার ভেতরটা অসহ্য ক্রোধে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। সে বলে, 'অরূপের একটা কেন দশটা বিয়ে দিন, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। আপনাদের বাড়িতে আসার প্রয়োজনই হতো না। নেহাত ঝিলিকের জন্যে আসতে হয়।'

'ঝিলিকের সঙ্গে তোমার দেখা হওয়াটা আর বাঞ্ছনীয় নয়।'

'তার মানে?'

'সেটা বোঝার মতো বয়েস তোমার হয়েছে।'

মুখ শক্ত হয়ে ওঠে শমিতার। রুক্ষ স্বরে সে বলে, 'আমার মেয়ে যতদিন আছে, আমাকে আসতেই হবে। আপনাদের অন্য কোনো ব্যাপারে আমার

ইন্টারেস্ট নেই।'

'আসতে দিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু তুমি যা টাইপ—' বলতে বলতে থেমে যান মৃণালিনী।

দাঁতে দাঁত চাপে শমিতা, 'থামলেন কেন, যা বলতে চান পরিষ্কার করে বলুন।'

'তোমার যা জীবনযাপন তাতে—' তীক্ষ্ণ একটা ইঙ্গিত দিয়ে সোজাসুজি শমিতার চোখের দিকে তাকান মৃণালিনী।

ছুরির ফলার মতো ধারাল গলায় শমিতা বলে, 'কী বলতে চাইছেন আপনি ?'

'লোকের মুখে তোমার সম্বন্ধে যা শুনতে পাই—ছিঃ ! সবাই বলে তোমার সঙ্গে ঝিলিকের বেশি দেখা হলে ওর ক্ষতি হয়ে যাবে। এই বংশের মেয়ে, তাকে রক্ষা তো করতে হবে।'

'এই বংশের মেয়ে হতে পারে, কিন্তু তাকে আমি দশ মাস গর্ভে ধারণ করেছি। আমি তার মা।'

'শুধু পেটে ধরলেই মা হওয়া যায় না। সন্তানের জন্য ভদ্র, সংযতভাবে চলতে হয়। বেলেল্লাপনাও করব, আবার মা হব—এ দুটো একসঙ্গে হয় না। সে যাক, তুমি এখন যেতে পার।'

'যাবার আগে ঝিলিকের সঙ্গে দেখা করব।'

'দেখা হবে না।'

'কেন ?'

'সে বাড়ি নেই।'

'ছায়া যে বলল, আছে।'

মৃণালিনী বলেন, 'কে কী বলেছে আমার জানার দরকার নেই। আমি যখন বলেছি নেই তখন নেই।'

এতক্ষণ চোয়াল চেপে যুদ্ধ চালাবার পর এবার ভেঙেই পড়ে শমিতা। বলে, 'কোর্ট কিন্তু আমাকে সপ্তাহে একবার ঝিলিককে দেখে যাবার অনুমতি দিয়েছে। আপনি কি চান আমি এ নিয়ে কোর্টে যাই ?'

'যেদিন ইচ্ছে। কোর্ট তো জানে না, এই ক'বছরে তোমার স্বভাবচরিত্র কতটা বদলে গেছে ! তুমি আদালতে গেলে সেটা আমরা জানাতে পারব।

জজকে জানাবো, নামতে নামতে কোন অতলে গিয়ে তুমি ঠেকেছ। তাঁকে জিজ্ঞেস করব, তোমার মতো একটি মেয়েমানুষের সঙ্গে ঝিলিকের দেখা হওয়াটা তার পক্ষে নিরাপদ কিনা।' বলে আর দাঁড়ান না মৃণালিনী, বাইরে বেরিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে চলে যান।

ঝিলিকের সঙ্গে মৃণালিনী দেখা করতে দিলেন না। ভবিষ্যতে এ বাড়ির দরজাও চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। কষ্টে বুকের ভেতরটা ভেঙেচুরে যাচ্ছিল শমিতার। অসহ্য একটা কান্না গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে যেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে, তারপর আচ্ছন্নের মতো প্রায় টলতে টলতে বাইরের রাস্তায় গিয়ে সেই ট্যাক্সিটায় ওঠে।

ফ্রন্ট সিটে বসে ছিল সুরজিৎ। পেছনের সিটে পারুল, তার পাশে বসল শমিতা।

সামনে থেকে সুরজিৎ বলে, 'এবার বাড়ি ফিরবেন তো ?'

ধরা ধরা, ঝাপসা গলায় শমিতা বলে, 'আর কোথায় যাব !'

ভীষণ ভাঙাচোরা আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে শমিতাকে। চোখ টকটকে লাল, মনে হয় সে দুটো ফেটে যেন ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। পাতলা ঠোঁট বার বার কুঁচকে যাচ্ছিল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে তীব্র কষ্টদায়ক কোনো আবেগকে সে যেন সামলে রাখতে চেষ্টা করছিল।

শমিতার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে সুরজিৎ। নিচু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে শমিতা দেবী ?'

শমিতা উত্তর দেয় না, দু'হাতে মুখ ঢেকে আচ্ছন্নের মতো বসে থাকে। তার ডান পাশ থেকে বিমূঢ়ের মতো পারুল তাকে লক্ষ করতে থাকে।

শমিতা মুখ থেকে হাত সরায় না, কথাও বলে না।

সুরজিৎ উৎকণ্ঠিতের মতো এবার বলে, 'আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে শমিতা, ঝাপসা গলায় বলে, 'না।'

'তাহলে ?'

শমিতা উত্তর দেয় না।

সুরজিৎ ব্যগ্রভাবে বলে, 'কী হল, বলুন—'

আচমকা মুখ থেকে হাত সরিয়ে শমিতা বলে, 'সত্যিই শুনতে চান ?'

'যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

'আপত্তির আর কি!' শমিতার রক্তাভ চোখের মণি এখন জলে ভাসছে। কপালের দু'পাশের রগদুটো দপ দপ করে সমানে লাফাচ্ছে। সে বলে, 'ট্যাক্সিতে বসে এসব কথা বলা যাবে না। ইচ্ছে হলে আমার স্যুইটে যেতে পারেন।'

দশ

তার স্যুইটের ড্রইংরুমে মুখোমুখি বসে আছে শমিতা আর সুরজিৎ। ভেতর দিকের দরজার কাছে পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে ছিল পারুল। যে বাড়ি থেকে খানিক আগে শমিতা আচ্ছন্নের মতো বেরিয়ে এসেছিল সেখানে কী ঘটতে পারে সে ভেবে পাচ্ছে না। শমিতার জন্য ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার। অদ্ভুত এক কান্না ডেলা পাকিয়ে বুকের ভেতর থেকে যেন উঠে আসছিল!

ট্যাক্সিতে যা জিজ্ঞেস করেছিল এবারও সেই প্রশ্নটাই করে সুরজিৎ, 'যোধপুর পার্কের ঐ বাড়িটায় যখন ঢুকলেন, তখন আপনাকে খুব নরমাল লাগছিল, চোখেমুখে কোনোরকম টেনশানের ছাপ ছিল না কিন্তু বেরিয়ে এলেন একেবারে আলাদা মানুষ। টোট্যালি ক্রাশড। কী হয়েছিল ওখানে?' আন্দাজ করছি মারাত্মক কিছু—'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে শমিতা। তারপর ভাঙা ভাঙা স্বরে বলে, 'ওটা একসময় আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল, ওরা আমাকে আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে দিল না।'

সুরজিতের মাথায় ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে যায়। সে বলে, 'শ্বশুরবাড়ি ছিল মানে?'

মুখ নিচু করে শমিতা বলে, 'আপনাকে কাল বলেছিলাম না, আমি ডিভোর্সি—'

সুরজিতের মনে পড়ে যায়। দ্রুত বলে ওঠে, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। কারা আপনার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে দিল না?'

'আমার শাশুড়ি।'

'কেন ?'

শমিতার স্বভাবে ছিঁচকাঁদুনে ভাবটা একেবারেই নেই। নিজের দুঃখ নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতে সে মোটেই পছন্দ করে না, তা ছাড়া সুরজিতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকলেও এমন ঘনিষ্ঠতা নেই যে তার কাছে প্রাণ খুলে অকপটে সব বলা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে সে এতটাই বিপর্যস্ত যে সেটা কাউকে না বলা পর্যন্ত যেন স্থির হতে পারছিল না।

তবু বলে, 'সে সব শুনতে ভাল লাগবে না।'

সুরজিৎ বলে, 'সেটা আমি বুঝব। শুরু করুন।' শমিতার কথা শোনার জন্য সে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে।

'ঠিক আছে।'

শমিতার বলা যখন শেষ হয়, বিকেল ফুরিয়ে আসছে। পশ্চিম দিকের লম্বা লম্বা হাই-রাইজগুলোর আড়ালে সূর্যটা বেশ কিছুক্ষণ আগেই নেমে গেছে। বাসি গাঁদাফুলের পাপড়ির মতো এখন রোদের রং। অনেক নিচে ল্যান্সডাউন রোড থেকে গাড়ির হর্নের সরু মোটা নানা ধরনের আওয়াজ আবছাভাবে উঠে আসছিল। মনে হচ্ছিল ওগুলো এই পৃথিবীর নয়, অন্য কোনো অচেনা, অনাবিস্কৃত গ্রহের শব্দপুঞ্জ।

সবটা শোনার পর শমিতার প্রতি খুবই সহানুভূতি বোধ করছিল সুরজিৎ। এই দারুণ স্মার্ট, ঝকঝকে মেয়েটা যে এতটা দুঃখী কে ভাবতে পেরেছিল। কার মধ্যে কতটা কষ্ট জমা হয়ে আছে বাইরে থেকে দেখে তার কতটুকুই বা বোঝা যায়। সুরজিৎ বলে, 'ঝিলিকের সঙ্গে আপনার দেখা করাটা কোনোভাবেই ওরা বন্ধ করতে পারে না। আপনি কোর্টে গেলে আপনার প্রাক্তন শ্বশুর-শাশুড়ি বিপদে পড়ে যাবেন। আমার এক বন্ধু খুব নাম-করা অ্যাডভোকেট। দরকার মনে করলে তার পরামর্শ নিতে পারেন। আমি যোগাযোগ করে দেবো।' একটু থেমে আবার বলে, 'ওদের ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।'

শমিতা বলে, 'একটু ভাবি, তারপর আপনাকে জানাবো।'

সুরজিৎ নিজের অজান্তেই যেন আলতোভাবে শমিতার একটা হাত ছোঁয়। শমিতা বাধা দেয় না।

মাত্র দু'দিনের মধ্যে সুরজিৎ অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে। অনেক

সময় দশ বছর পাশাপাশি থাকলেও সম্পর্কটা সামান্য চেনাশোনার স্তরেই আটকে থাকে। আবার কখনও কখনও বিস্ময়কর বা বেদনাদায়ক কোনো ঘটনার মুহূর্তে স্বল্প চেনা কেউ অন্য একজনের বড় আপনজন হয়ে ওঠে।

সুরজিতের কথাবার্তা, আচরণ—সবই এখন পর্যন্ত খুব আন্তরিকতাপূর্ণ। তার সহানুভূতি এবং সহৃদয়তা শমিতার বুকের ভেতরে কোথায় যেন স্পর্শ করে যাচ্ছিল। জীবনে এমন উপযাচক হয়ে কাউকে পাশে এসে দাঁড়াতে আগে আর কখনও দেখেনি শমিতা। সুরজিতের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, সম্ভ্রমে মন ভরে যায় তার।

সুরজিৎ এবার বলে, 'ঝিলিক সম্পর্কে কী ডিসিসান নেওয়া যায়, পরে আলোচনা করা যাবে। এখন—' তার কথা শেষ হতে-না-হতেই হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে।

শমিতা ফোনটা তুলে নিয়ে 'হ্যালো' বলতে ওধার থেকে চাপা, খসখসে গলা ভেসে আসে, 'হামি শমিতা মেমসাবের সঙ্গে বাতচিত করতে চাই।'

কণ্ঠস্বরটি কোনো অবাঙালি পুরুষের। সেলসের ব্যাপারে অজস্র অবাঙালির সঙ্গে শমিতার যোগাযোগ আছে। তারা মাঝেমাঝেই ফোন করে কিন্তু গলাটি তাদের কারো নয় বলেই মনে হচ্ছে। তা ছাড়া যারা তার চেনাজানা তারা ফোন করেই প্রথমে নিজেদের নাম বলে। অত্যন্ত জরুরি বিষয়ে এই মুহূর্তে যখন সুরজিতের সঙ্গে কথা হচ্ছে তখন এই ফোনটা আসায় ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট বিরক্ত হয় শমিতা। বেশ রুক্ষ গলায় বলে, 'কে আপনি ?'

লোকটা বলে, 'তার আগে বলেন ম্যাডাম আপনি কে ? শমিতা মেমসাব ছাড়া দুসরা কাউকে আপনার নাম বাত়াব না।'

শমিতা বলে, 'আমিই শমিতা মেমসাহেব। এবার নামটা বলবেন কি ?'

লোকটা বলে, 'জরুর, জরুর। আমি গণপতি।'

এই নামটা আগে কোথায় যেন শুনেছে শমিতা। পলকে মনে পড়ে যায়—পারুলের মুখে। যে তিনটে বদমাশ তাকে দূরে কোথাও পাচার করার মতলব করেছিল তাদের ভেতর গণপতি নামে একজন ছিল।

মুখটা এবার শক্ত হয়ে ওঠে শমিতার। সেই সঙ্গে খুবই স্তম্ভিত হয়ে যায়। স্কাউন্ড্রেলটা কিভাবে তার নাম এবং ফোন নম্বর জোগাড় করল কে জানে। পরক্ষণে মনে হয়, ওরা যে টাইপের লোক তাতে সবই সম্ভব। বলে,

'কী চাই ?'

গণপতি হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে বলে, 'কী চাই তা তো আপনি জানেন।'

শমিতা উত্তর দেয় না।

গণপতি এবার বলে, 'আপনার সাথ আমার কোঈ দুশমনি নেই। কোঈ জান-পয়চান ভি ছিল না। তবে কেন আমার নুকসান করছেন ?'

শমিতা কঠোর গলায় এবার বলে, 'যা বলতে চাইছ, পরিষ্কার করে বল।'

'ঐ লড়কীটাকে, মতলব পারুলকে বার করে দিন। আপনি ওহী রোজ এয়ারপোর্টে আমাদের হয়রানি করেছেন, পারুলকে জবরদস্তি ছিনকে নিয়ে গেছেন—এসব কথা আমরা মনে রাখব না।'

শমিতা গলার স্বর অনেকখানি চড়িয়ে বলে, 'তোমার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

হাসির হালকা একটু আওয়াজ শোনা যায়। গণপতি বলে, 'সাহসের কিছু নেই মেমসাব। নগদ পাইসা দিয়ে মাল খরিদ করেছি। সেই মাল শিরিফ ফেরত চাইছি।'

শমিতার মনে পড়ে, এয়ারপোর্টে লোকটা তাকে প্রচণ্ড শাসিয়েছিল কিন্তু এখন খুব নরম গলায় কথা বলছে। পরিষ্কার বোঝা যায় এটা তার চতুর চাল। ভাল কথায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে পারুলকে বার করে নিয়ে যাওয়া ছাড়া তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

শমিতা বলে, 'পারুলকে ফেরত দেবো না। ও আমার কাছেই থাকবে।'

গণপতি বলে, 'সোচবুঝকে বলুন মেমসাব।'

'মানে ?'

'ও লড়কী আপনার কেউ না, কোঈ রিস্তে নেহী। তবে বেফায়দা ওর জন্যে 'রিস্ক' নিতে যাচ্ছেন কেন ?'

শমিতা বলে, 'রিস্ক, কিসের রিস্ক ?'

গণপতি বলে, 'মেমসাব, আপনি যখন অফিসে যান, লড়কীটা তখন একেলী ফলাটে (ফ্ল্যাটে) থাকে। সেটা 'রিস্ক' না তো কী ?'

শমিতা উত্তর দেবার আগে গণপতি ফের বলে, 'হর মাহিনা আপনাকে কলকাত্তার বাহার ভি যেতে হয়। তখন লড়কীটাকে কোথায় রাখবেন ?'

দেখা যাচ্ছে গণপতি তার সম্পর্কে অনেক খবর জোগাড় করেছে। শমিতা বলে, 'এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আর কখনও আমাকে ফোন করে বিরক্ত করবে না।' বলতে বলতে ফোন নামিয়ে রাখে সে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেটা বেজে ওঠে। 'হ্যালো' বলতেই ফের গণপতির গলা শোনা যায়, 'মেমসাব অত গুস্‌সা করবেন না, ব্লাড প্রেসার চড়লে তবিয়ত খারাপ হবে।'

লোকটা পরিষ্কার তাকে ব্যঙ্গ করছে। শমিতা এতক্ষণ ধৈর্য ধরেই ছিল, এবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, 'শাট আপ রাসকেল, আমার সঙ্গে তামাশা করছ!'

গণপতির রেগে ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। সে বলে, 'তামাশা মতলব মাজাক! কী বলছেন মেমসাব, আমার মতো ছোটে আদমী আপনার সাথ মাজাক করতে পারে!'

লোকটার কথাবার্তা থেকে বিনয় চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরলেও তার মধ্যে যে সুপ্ত বিদ্রূপ মেশানো সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না শমিতার। নোংরা একটা অ্যান্টি-সোশালের সঙ্গে একেবারেই কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। ফোনটা যখন সে ফের নামিয়ে রাখতে যাবে, গণপতি বলে ওঠে, 'মেমসাব, আপনাকে একটা কথা বলি—'

'কী?'

'কেন একটা বাজে লড়কীর জন্যে আপনি আপনার ঘরে ঝামেলা ঢোকাচ্ছেন?'

'ঝামেলা মানে?'

'এ তো বহোৎ সিম্পল। লেড়কীটাকে ছেড়ে না দিলে আপনাকে তো আমি ছাড়ব না।'

গণপতির গলার স্বর এবার অন্যরকম শোনায়। চোয়াড়ে এবং উদ্ধত। একটু চমকে ওঠে শমিতা। পরক্ষণে দাঁতে দাঁত চেপে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'সান অফ আ বিচ, আমাকে ভয় দেখাচ্ছ!'

গণপতি বলে, 'আপনি ভদ্দরঘরকা জেনানা, তাই এতক্ষণ 'রিসপেক্ট' দিয়ে কথা বলেছি। লেকেন আপনি গালি দিলেন। বুরা জবান আপনার চেয়ে আমি অনেক বেশি জানি। সেগুলো আমার মুহ্ থেকে বার করাবেন না।'

শরীরের সব রক্ত মাথায় চড়ে গিয়েছিল শমিতার। তীব্র গলায় সে বলে,

'ঠিক আছে, আমি দেখব কী করে তুমি পারুলকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পার।' বলেই ঝড়াং করে ক্রেডেলের ওপর টেলিফোনটা রেখে দেয়।

গণপতি এবার আর ফোন করে না।

অসহ্য রাগে এবং উত্তেজনায় কাঁপছিল শমিতা। বলে, 'লোকটার কী স্পর্ধা, আমাকে থ্রেটেন করছিল!'

যদিও গণপতির কথা শোনা যায় নি কিন্তু শমিতা যেভাবে উত্তর দিচ্ছিল তা থেকে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে সুরজিতের কাছে। সে বলে, 'রোগগুলো এবার ওপেন কনফ্রনটেশনে চলে এল।'

শমিতা বলে, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'এখনই কিছু একটা করা দরকার।'

জিজ্ঞাসু চোখে সুরজিতের দিকে তাকায় শমিতা।

সুরজিৎ বলে, 'পারুল তো আপাতত আপনার কাছেই রইল। প্রথমে ওর প্রোটেকশনের ব্যবস্থাটা করে ফেলি।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে শমিতা, 'হ্যাঁ। সবার আগে সেটাই দরকার।'

সুরজিৎ বলে, 'লোকগুলো খুবই মারাত্মক টাইপের। যে কোনো সময় যে কোনো মিসচিফ করে ফেলতে পারে। ওদের টার্গেট শুধু পারুলই না, আপনিও। আপনার প্রোটেকশনও ভেরি ভেরি আর্জেন্ট।'

সুরজিৎ এখান থেকেই ফোন করে লালবাজারে একজন সিনিয়ার অফিসার প্রতাপ মজুমদারকে ধরে ফেলে। প্রতাপের সঙ্গে ওর দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। পারুলের সমস্যাটা তাকে জানিয়ে বলে, 'মেয়েটার সিকিউরিটির একটা ব্যবস্থা করতে হবে প্রতাপদা।'

প্রতাপ বলেন, 'তা তো করতেই হবে। ল্যান্সডাউনে শমিতাদেবীর বাড়ির সামনে কিছুদিনের জন্য পুলিশ পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। শমিতাদেবী যতক্ষণ বাইরে থাকবেন সেই সময়টা পাহারা থাকলেই চলবে তো?'

'হ্যাঁ। তা চলবে। তবে শমিতাদেবীরও লাইফের রিস্ক আছে।'

'তা তো আছেই। স্কাউন্ড্রেলগুলোর হাত থেকে মেয়েটাকে উনি উদ্ধার করে এনেছেন। ওরা কি সহজে ছেড়ে দেবে? শমিতাদেবীকে সাবধানে থাকতে বলো।'

'ওঁরও প্রোটেকশনের দরকার। এ নিয়ে কিছু করা যায়?'

প্রতাপ বলেন, 'দেখ সুরজিৎ, এতজনের জন্যে গার্ডের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। তাই বলছিলাম, শী মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল। কিছুদিন এভাবে চলুক, পরে তেমন বুঝলে কিছু করা যায় কিনা, ভেবে দেখব।'

সুরজিৎ বলে, 'আচ্ছা। আমার একটা অনুরোধ আছে প্রতাপদা।'

'কী ?'

'শমিতাদেবীর বাড়ির সামনে প্লেন ড্রেসের পুলিশ রাখলে ভাল হয়। ইউনিফর্ম-পরা গার্ড রাখলে ওরা ভড়কে যাবে। যদি কোনোভাবে একজনকেও ধরা যায়, দলের অন্য বদমাশদেরও পাকড়াও করা যাবে। হোল র‍্যাকেটটা একবার ভেঙে দিতে পারলে শমিতাদেবীরা পুরোপুরি সেফ।'

প্রতাপের হাসির শব্দ ওধার থেকে ভেসে আসে। তিনি বলেন, 'তুমি যা যা বললে সে সব আমার মাথাতেও ঘুরছে। প্লেন ড্রেসের গার্ডই রাখব। আমার ধারণা লোকগুলো ধরা পড়বে।'

সুরজিৎ বলে, 'এদের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হওয়া দরকার।'

'আগে ধরা পড়ুক, তারপর তো পানিশমেন্ট।'

'আপনারা চেষ্টা করলে ধরা পড়তে বাধ্য। এমন শিক্ষা দেবেন যাতে আর কেউ যেন মেয়ে পাচারের চিন্তা কোনোদিন মাথায় না আনে।'

'দেখা যাক। রাসকেলগুলো ধরা পড়লে হয়তো দেখা গেল, ওপর দিকের কারো সঙ্গে কানেকশান আছে। তখন আমাদের কিছু করার থাকবে না। কার শেকড় মাটির তলায় কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে কে জানে। সামটাইমস ইউ আর হেল্পলেস সুরজিৎ।'

'তেমন কেউ যদি ওদের হয়ে প্লিড করতে আসে নাম বলবেন। কাগজে আমরা তাকে এক্সপোজ করে বারটা বাজিয়ে দেবো।'

প্রতাপ শব্দ করে হেসে ওঠেন।

সুরজিৎ বলে, 'হাসলেন যে ?'

'আমাদের মতো তোমাদের প্রেস মিডিয়ারও হাত-পা বাঁধা। লোকটার তেমন কানেকশান থাকলে তুমিও কিছু করতে পারবে না। আচ্ছা এখন ছাড়ি।'

সুরজিৎ প্রতাপকে যা বলেছে তার সবটাই খুব মন দিয়ে শুনেছে শমিতা। প্রতাপের উত্তর শুনতে না পেলেও বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সুরজিৎ ক্রেডেলে ফোন নামিয়ে রাখতেই সে বলে, 'কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব !'

সুরজিৎ বলে, 'দেখুন, এসব ফর্মাল কথাবার্তা আমার একদম ভাল লাগে না। কৃতজ্ঞতা আবার কিসের ! বন্ধু হিসেবে—'

হাতজোড় করে শমিতা বলে, 'স্যরি, এক্সট্রিমলি স্যরি—'

তার বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলে সুরজিৎ। বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি আজ চলি, কাল সন্ধের পর একবার দেখা করে যাব। এর মধ্যে যদি কিছু দরকার হয় আমার অফিসে কি বাড়িতে ফোন করবেন।'

শমিতা বলে, 'উঠবেন মানে ! সেই সকাল থেকে আপনাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, এক কাপ চা-ও তো খাওয়া হয়নি।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ায় খুব লজ্জিত হয়ে ওঠে,'আরে, দুপুরেও তো লাঞ্চ করেন নি। ছি ছি, সারাক্ষণ নিজের দুশ্চিন্তা নিয়ে ছিলাম। এক্ষুণি চা করছি। আজ অফিস থেকে ছুটি নিন। একেবারে ডিনার খেয়ে যাবেন।'

সুরজিৎ বলে, 'না না, আপনাকে বিব্রত হতে হবে না। চা আর ডিনার আরেক দিন হবে। অফিসে জরুরি কাজ আছে, আজ আর বসতে পারব না।' বলতে বলতে উঠে পড়ে সে।

এগার

সুরজিৎ চলে যাবার পর শমিতা তার আর পারুলের জন্য কোনোরকমে দু' কাপ চা করে নিয়ে আসে কিচেন থেকে, সঙ্গে কিছু বিস্কুট।

গরম চা খেয়ে ক্লান্তি কিছুটা কাটে শর্মিতার। পারুলও এই ড্রইংরুমে কার্পেটে বসে চা খাচ্ছিল। শমিতা অন্যমনস্কর মতো একবার তার দিকে তাকায়। মেয়েটা পলকহীন তাকে লক্ষ করছে। পারুলের মুখ গাঢ় বিষাদে মাখানো।

শমিতা ওর দিক থেকে মুখ ফেরায়। আজ সারা দিনে একের পর এক যা ঘটে গেল সেগুলো মাথার ভেতর ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে তার। পারুলের কোনো ব্যবস্থা আপাতত করা গেল না, সে দুর্ভাবনা তো রয়েছেই। তার ওপর গণপতির ফোনটা তার রক্তচাপ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে সবচেয়ে যা তাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে তা হলো মৃণালিনীর বিশ্রী ব্যবহার।

এই মুহূর্তে সেটা তার স্মৃতির ভেতর থেকে উঠে আসতে লাগল। ঝিলিকের সঙ্গে আর দেখা হবে না, এটা ভাবতেই মাথার ভেতর আগুনের চাকার মতো কিছু একটা অনবরত ঘুরে যেতে থাকে।

অফিসের কাজে কখন কোথায় তাকে থাকতে হবে, এটা ভেবে অরূপদের কাছে ঝিলিকের থাকার কথায় সে রাজি হয়েছিল। নইলে ডিভোর্স হলে নাবালিকা মেয়েরা এমনিতেই মায়ের কাছে থাকে। দেখা যাচ্ছে সেদিন রাজি না হলেই ভাল হতো। এখন আপসোস হয় ঝিলিককে কেন নিজের কাছে নিয়ে এল না? তাকে স্বচ্ছন্দে কোনো রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে রেখে দেওয়া যেত, কাজকর্মের কারণে হিল্লি-দিল্লি ছোটাছুটির ফাঁকে ঝিলিকের ছুটি পড়লে তাকে নিয়ে আসতে পারত শমিতা। কী ভুল যে তার হয়ে গেছে! সমস্ত জীবনের জন্য নিজের চূড়ান্ত ক্ষতি করে ফেলেছে সে।

আচমকা উঠে দাঁড়ায় শমিতা। ঘরময় অস্থির পায়ে লক্ষ্যহীনের মতো হাঁটতে থাকে। কী যে করবে, কিছুই ভেবে পায় না সে।

হঠাৎ একসময় শমিতার মনে হয়, ঝিলিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলবে। সে তো খানিকটা বড় হয়েছে। মায়ের দুঃখ, অসম্মান নিশ্চয়ই সে বুঝবে।

শমিতা একবার ভাবল, এখনই ঝিলিকের সঙ্গে কথা বলে মনের ভারটা হালকা করে নেবে। পরক্ষণে ঠিক করে, পরে ওকে ফোন করবে।

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে সে। মনটা ভীষণ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কিছুই ভাল লাগছে না, নিদারুণ এক অস্থিরতা তার বুকের ভেতরটা অনবরত ঝাঁকিয়ে চলেছে যেন।

একসময় দেওয়াল ঘড়ি টুং টাং আওয়াজ করে জানিয়ে দেয় ন'টা বেজেছে। আর রাত করা ঠিক হবে না। একবেলা না খেলে শমিতার কিছু যায় আসে না। কিন্তু পারুল যখন থেকেই গেল তখন ওর জন্য কিছু না করলেই নয়। সেই সকালে নাকেমুখে সামান্য কিছু গুঁজে ওরা বেরিয়ে পড়েছিল, তারপর এক কাপ চা আর খান দুই বিস্কুট ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি। নিশ্চয়ই প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে মেয়েটার।

শমিতা আর বসে থাকে না। সোফা থেকে উঠতে উঠতে তার চোখে পড়ে মেঝেতে বসে সেই আগের মতোই পলকহীন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে পারুল। সেই সকাল থেকে এখন পর্যন্ত সারাদিনে যা যা ঘটে

গেল তার স্পষ্ট ছাপ পড়েছে মেয়েটার ওপর। কেমন যেন বিপর্যস্ত আর উদ্‌ভ্রান্ত।

মেয়েটার জন্য হঠাৎ খুব মমতা বোধ করে শমিতা। পারুলের দায়িত্ব যখন নিয়েই ফেলেছে তখন আর দ্বিধা নয়, ওকে দু' হাতে আগলে রাখবে। ওর জন্য যতদূর যেতে হয় যাবে। খুব কোমল গলায় বলে, 'যাও, হাতমুখ ধুয়ে জামা-কাপড় বদলে নাও।' বলে নিজের বেডরুমে চলে যায়। তারপর দ্রুত বাইরের পোশাক পালটে সোজা কিচেনে।

পারুলও কোনোরকমে শাড়িটাড়ি পালটে কিচেনে এসে শমিতার হাতের কাছে এটা সেটা এগিয়ে দেয়। অবশ্য, রান্নাটা সে নিজেই করতে চেয়েছিল, শমিতা করতে দেয়নি।

খাওয়া-দাওয়া চুকতে চুকতে দশটা। তারপর পারুলকে তার ঘরে পাঠিয়ে নিজের বেডরুমে এসে শুয়ে পড়ে শমিতা। এই ঘরের টেলিফোনটা খাটের পাশে একটা নিচু টেবলের ওপর থাকে। সে জানে সাড়ে দশটার আগে কখনও ঘুমোয় না ঝিলিক। রাতে পড়াশোনার পর ডিনার সেরে আধ ঘণ্টা টিভি দেখে, তারপর শুতে যায়। তবে একটা সমস্যা আছে। ও বাড়ির টেলিফোনটা থাকে দোতলার ড্রইংরুমে। সে ফোন করলে মৃণালিনী যদি ধরেন মুশকিল হবে। তিনি হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ঝিলিকের সঙ্গে তাকে কথা বলতে দিতে চাইবেন না। পর মুহূর্তে শমিতা ভাবে এই প্রবলেমটা বরাবরই থাকবে। মৃণালিনী ক্বচিৎ বাড়ি ছেড়ে বেরোন। ফোন তাঁর হাতে পড়ার সম্ভাবনাই সব থেকে বেশি।

যা হবার হবে, আমি আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলবই, এমন একটা বেপরোয়া মনোভাব শমিতাকে ভেতর থেকে উসকে দিতে থাকে। মেয়ের ব্যাপারে মৃণালিনীর বাধা বা খবরদারি কোনোভাবেই মেনে নেবে না। রিসিভারটা তুলে বোতাম টিপতে শুরু করে সে। একটু পর ওধার থেকে ভেসে আসে, 'হেলো—'

ছায়ার গলা। যাক, আর দুশ্চিন্তা নেই।

শমিতা বলে, 'আমি বৌদি বলছি—'

ছায়া প্রায় হাউমাউ করে ওঠে, 'বৌদি, আপনাকে মা ত্যাখন অমন করে বললে। আমার কী কষ্ট যে হচ্ছিল! ভাবলাম কাল আপনার কাচে

একবার যাব—'

দুপুরে মৃণালিনী যে তার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছেন সেটা নিশ্চয়ই ছায়া আড়াল থেকে লক্ষ করেছে। খুবই দুঃখ পেয়েছে সে। মেয়েটা সত্যিই তাকে ভালবাসে। তবে কথাটা একটু বেশি বলে। যেভাবে সে শুরু করেছে সহজে তাকে কিছু বলার সুযোগ দেবে বলে মনে হয় না। ছায়াকে দ্রুত থামিয়ে শমিতা বলে, 'ঠিক আছে, কাল যখন ইচ্ছে এস। আমি সারাদিন ফ্ল্যাটেই থাকব।'

এখানকার ঠিকানা ছায়া জানে। আগেও মৃণালিনীদের লুকিয়ে বার কয়েক এই স্যুইটে এসেছে। সে বলে, 'আপনি আপিসে যাবেন না?'

'না। ছুটি নিয়েছি। ঝিলিক কোথায়?'

'তেতলায় সব্বার সঙ্গে বসে টিভি দেখচে।'

চট করে শমিতা ভেবে নিল, দোতলায় ঝিলিকের বেডরুম। সেখানে ইচ্ছা হলে একটা প্লাগ লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ও স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে। ওকে যদি কোনোভাবে দোতলায় নামিয়ে আনা যায় খুব ভাল হয়। মৃণালিনীরা তেতলায় আছেন, ঝিলিক নিচে এলে প্রাণ খুলে কথা বলা যাবে। এমন সুযোগ বার বার পাওয়া যাবে না।

শমিতা বলে, 'ঝিলিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই ছায়া—'

ছায়া বলে, 'হ্যাঁ, বলুন। ওরে এ বাড়ির সব্বাই মিলে দিনরাত বুঝোয়ে বুঝোয়ে আপনার শত্তুর করে তুলচে। আমার একেক সোময় মনে হয়, এখানকার চাকরির মাথায় নাথি মেরে বেরুয়ে যাই।'

শমিতা ওর কথায় কান দেয় না। বলে, 'ঝিলিককে একবার নিচে ডেকে আনতে পারবে?'

'আনা বড় মুশকিল গ বৌদিদি। টিভির কাচে সেঁটে বসে আচে। উঠে আসতে কি চাইবে?'

হতাশ সুরে শমিতা জিজ্ঞেস করে, 'তা হলে?'

ছায়া বলে, 'দাঁড়ান বৌদিদি, আমারে এট্টু ভাবতে দ্যান।'

ব্যাকুলভাবে শমিতা এবার বলে, 'ওকে আমার খুব দরকার ছায়া। তখন ওর ঠাকুমা আমাকে কথা বলতে দিল না। মনটা এত খারাপ হয়ে আছে যে কী বলব!' কষ্টে তার গলার স্বর কাঁপতে থাকে।

শমিতার ব্যাকুলতা ছায়াকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়। সে বলে, 'অত ভেঙে পড়বেন নি বৌদিদি। কথা আমি বলিয়ে দেবোই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর ষড়যন্ত্রকারীর মতো ছায়া গলা নামিয়ে বলে, 'এট্টা ফিকির মাথায় এয়েচে।'

'কী ?' শমিতা উৎসুক হয়ে ওঠে।

'আমি ঝিলিক দিদিরে বলব, তার এক বন্ধু রিখি দিদিমণি ফোন করেচে। তা হলে কেউ কিচু বুঝতে পারবেনি।'

ছায়া তুখোড় মেয়েমানুষ। তার ওপর বহু বছর কলকাতায় থেকে, বহু ঘাটের জল খেয়ে, এই শহরের নানা মানুষ এবং তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে তার বুদ্ধির ধার দারুণ বেড়ে গেছে। শমিতা জানে রিখি ঝিলিকের প্রাণের বন্ধু। তার নাম শোনামাত্র টিভি ফেলে ছুটে নিচে নেমে আসবে। বলে, 'সেই ভাল। এক কাজ কর, ফোনটা ঝিলিকের ঘরে লাগিয়ে ওকে ডেকে আন।' ঘরে লাগাবার উদ্দেশ্য, নিরিবিলিতে ওর সঙ্গে কথা বলা যাবে। কোনো কারণে মৃণালিনী বা অন্য কেউ নিচে নেমে এলেও ওর ঘরে না ঢোকার সম্ভাবনাই বেশি। নাতনী তার ক্লাসের বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে, নিশ্চয়ই সে সব আড়ি পেতে শুনবেন না মৃণালিনী। তা ছাড়া আজ দুপুরে যে শমিতাকে তিনি অপমান করে বার করে দিয়েছেন সে এখন সরাসরি মেয়েকে ফোন করেছে, এটা অন্তত তিনি ভাবতে পারবেন না।

শমিতা বলে, 'সেই ভাল।'

কিছুক্ষণ পর ঝিলিকের সুরেলা গলা ভেসে আসে, 'কি রে রিখি, সন্ধেবেলা তোর সঙ্গে কথা বললাম। আসছে সানডে আমাদের বাড়ি আসছিস তো ? না কি ক্যানসেল করার জন্যে ফোন করছিস ?'

দু'বছর আগেও ঝিলিকের গলার স্বরটা ছিল সরু, পাতলা, অনেকটা বাঁশির আওয়াজের মতো। এখন সামান্য ভারি হয়েছে। মেয়ে বড় হচ্ছে তো। চেহারার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরও বদলে যেতে শুরু করেছে।

শমিতা বলে, 'রিখি না, আমি মা বলছি।'

'মা !'

গলা শুনে বোঝা গেল, ঝিলিক খুব অবাক হয়েছে।

শমিতা বলে, 'হ্যাঁ, আমি তোর মা।'

'কিন্তু ছায়াদি যে বলল রিখি ফোন করেছে!' ঝিলিকের বিস্ময়ের ঘোরটা এখনও কাটেনি।

শমিতা বলে, 'আমিই তাকে বলতে বলেছি। তোর ঠাকুমারা ওখানে বসে আছে তো ; তাই—'

তাকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে ঝিলিক বলে, 'কী বলবে বল।'

ভেতরে ভেতরে থমকে যায় শমিতা। গলার স্বর শুনে মনে হলো, ঝিলিক একটু যেন বিরক্ত। আগে তাকে দেখলে কিংবা তার ফোন পেলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত মেয়েটা। বিপাশাও সেদিন বলেছে তার জন্য সারাক্ষণ মন খারাপ করে থাকে ঝিলিক। তবে কি ও বাড়ির হাওয়া তার গায়ে লেগে গেছে এর মধ্যে ? শমিতা বলে, 'টিভির সামনে থেকে ডাকিয়ে এনেছি বলে রাগ করেছিস বুঝি—কি রে ?'

'না। যা বলার তাড়াতাড়ি বল।'

ঝিলিকের বলার ভঙ্গিতে কেমন যেন অসহিষ্ণুতা রয়েছে। শমিতা বলে, 'হ্যাঁ, বলছি। আজ দুপুরে তোকে দেখতে ও বাড়ি গিয়েছিলাম।'

ঝিলিক বলে, 'জানি, ছায়াদি আর ঠামু বলেছে।'

ঠামু বলতে ঠাকুমা অর্থাৎ মৃণালিনী।

'তুই জানিস আজ কী হয়েছে ?'

'কী ?'

ঝিলিক জিজ্ঞেস করল বটে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কেমন যেন কৌতূহলশূন্য। মনটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে যায় শমিতার। শিথিল গলায় সে বলে, 'আমাকে তোর ঠামু তাড়িয়ে দিলে, তোর সঙ্গে দেখা করতে দিলে না।'

ঝিলিক উত্তর দেয় না।

শমিতা বলে, 'কি রে, চুপ করে আছিস কেন ?'

ঝিলিক চাপা গলায় বলে, 'কী বলব ?'

'তোর ঠামু আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছে, তোকে কেউ বলেনি ?'

'ছায়াদি বলেছে।'

'তোর মনে একটুও কষ্ট হয়নি ?'

অস্পষ্টভাবে ঝিলিক বলে, 'হয়েছে।'

শমিতা ব্যগ্রভাবে বলে, 'তোর ঠাম্মুকে জিজ্ঞেস করিস নি কেন মাকে তাড়িয়ে দিলে ?'

'না।'

'কেন ?'

ঝিলিক বলে, 'সে কথা শুনে তোমার দরকার নেই।'

শমিতার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই মৃণালিনী তার সম্বন্ধে এমন কিছু বলেছেন যা ঝিলিক গোপন করতে চায়। একটু জোর দিয়েই শমিতা বলে, 'দরকার আছে। তুই বল।'

ঝিলিক এবার থেমে থেমে বলে, 'তোমার কথা বললে ঠাম্মু, দাদু, সবাই ভীষণ রাগ করে। তাই—'

'তাই তুই কিছু বলবি না ঝিলিক ?'

ঝিলিক চুপ করে থাকে।

শমিতা বুঝতে পারছিল, মেয়েটাকে ও বাড়িতে থাকতে দিয়ে মস্ত ভুল হয়ে গেছে। ঝিলিকের সবটুকু স্বত্ব এখন আর তার হাতে নেই, অনেকখানিই খোয়া গেছে। এভাবে আর কিছুদিন চললে হয়ত চিরকালের মতো তাকে হারাবে। ডিভোর্স তাকে অনেকখানিই ভেঙেচুরে দিয়েছে। কিন্তু ঝিলিককে হারানোর ক্ষতি সে সইবে কী করে ?

শমিতা বলে, 'কি রে, ফোন ছেড়ে দিলি ?'

ওধার থেকে সংক্ষিপ্ত উত্তর ভেসে আসে, 'না।'

'তুই বড় হয়েছিস। তোর মাকে এমন অপমান করল। সব জেনেশুনেও তুই চুপ করে থাকবি ?'

'এ বাড়ির কেউ চায় না তুমি আসো।'

বিমর্ষ স্বরে শমিতা বলে, 'জানি। কিন্তু না গিয়ে যে পারি না রে ঝিলিক—'

ঝিলিক জিজ্ঞেস করে, 'কেন ?'

'তুই ওখানে আছিস যে। তোর জন্যে সারাক্ষণ আমার মনে কী যে হয় বলে বোঝাতে পারব না।'

ঝিলিক কিছু বলে না।

একটু চিন্তা করে শমিতা বলে, 'ওরা যখন চায় না আমি ও বাড়ি যাই

তখন তোর জন্যে আমাকে কিছু একটা করতেই হবে।'

'কী করতে চাও?'

গলা শুনে মনে হলো ঝিলিক বেশ অবাক হয়েছে।

শমিতা বলে, 'দু-একদিনের ভেতর তোকে আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে আসব।'

ঝিলিক উত্তর দেয় না।

শমিতা বলে, 'এখন থেকে তুই আমার কাছে থাকবি।'

ঝিলিক এবারও চুপ।

শমিতা বলে, 'কি রে, সাড়া দিচ্ছিস না যে?'

ঝিলিক আধফোটা গলায় বলে, 'কী বলব!'

ব্যাকুলভাবে শমিতা বলে, 'তুই আমার কাছে থাকবি না?'

'ওরা তোমার সঙ্গে আমাকে থাকতে দেবে না।'

'ওরা কী করবে না-করবে সেটা ওদের ব্যাপার। তুই কি চাস? মায়ের কাছে থাকতে ইচ্ছে করে না তোর?' টেলিফোনে মুখ ঠেকিয়ে গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করে শমিতা।

ঝিলিক বলে, 'আমি বাবা, দাদু আর ঠামুকে ছেড়ে কোথাও থাকতে পারব না।'

বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যায় শমিতার। চমকে উঠে সে বলে, 'আমি তোর মা, ঝিলিক। মায়ের চেয়ে আপনজন আর কেউ হয় না।' তার কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মতো শোনায়।

ওধার থেকে কোনো জবাব নেই।

শমিতা ডাকে, 'এই ঝিলিক, বল—কিছু বল—'

ঝিলিকের সাড়া মেলে না।

একটানা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ডেকে যায় শমিতা। তারপর হঠাৎ একসময় খেয়াল হয়, ঝিলিক ওধারে ফোন নামিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ সে-ও ও বাড়ির আর সবার মতো তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না।

টেলিফোনটা ছুঁড়ে ফেলে দু-হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে থাকে শমিতা। অরূপের সঙ্গে ডিভোর্সের পরও এতটা ভেঙে পড়েনি সে। মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ড ভেঙেচুরে দুমড়ে মুচড়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেছে কিন্তু এমন কষ্ট আর কখনও হয়নি।

মনে আছে, বিবাহবিচ্ছেদটা যদিও অনিবার্য ছিল তবু আদালতের রায় বেরুবার পর বেশ কিছুদিন গভীর নৈরাশ্যে ডুবে গিয়েছিল শমিতা। মনে হচ্ছিল ঘোর শূন্যতা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরছে কিন্তু তার পরেই সে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়েছে। শমিতার মধ্যে এক অপরাজেয় যোদ্ধা রয়েছে। সে কখনও তাকে হাজার বিপর্যয়ের মধ্যেও নত হতে দেয় না। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে, ঝিলিক তার শরীর আর মনের সবটুকু শক্তি, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা—সমস্ত কিছু এক নিমেষে শেষ করে দিয়েছে।

দুই হাতের ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে যাচ্ছে শমিতার, তীব্র ব্যাকুলতায় পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। মনে হচ্ছে, এই পৃথিবীতে তার জন্য এমন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই যার জন্য বেঁচে থাকা যায়। শমিতার সর্বস্বই খোয়া গেছে।

কতক্ষণ কেঁদেছিল সে জানে না, হঠাৎ পায়ের পাতায় কার ছোঁয়া লাগতে চকিত হয়ে ওঠে। মুখ থেকে হাত সরাতে চোখে পড়ে খাটের পাশে মেঝেতে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে তার দু'পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে পারুল। কখন সে পাশের ঘর থেকে উঠে এসেছে, টের পাওয়া যায়নি।

শমিতা দেখতে পায়, মেয়েটার দু-চোখ জলে ভরে আছে, আর ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপছে।

কী হতে পারে পারুলের ? এই তো খানিক আগে পাশের ঘরে শুতে গেল। কিন্তু হঠাৎ উঠে এল কেন ? কোনো কারণে সে কি ভয় পেয়েছে ? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

বিমূঢ়ের মতো শমিতা জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে পারুল ? কাঁদছ কেন ?'

প্রথমটা উত্তর দেয় না পারুল। আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে থাকে শুধু।

শমিতা ফের বলে, 'কাঁদছ কেন, বল !'

পারুল ঝাপসা গলায় এবার বলে, 'আপনার জন্যি।'

'আমার জন্যে !'

'হ্যাঁ মেমসাহেব। আপনার মতো দুখী মানুষ পিথিবীতে আর লেই গ।'

শমিতা হতবাক। কী বলছে মেয়েটা ! স্থির চোখে সে পারুলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পারুল থামেনি, 'পরশু দিন য্যাখন এলুম আপনার এই বাড়ি-ঘরদোর,

এত দামি দামি জিনিসপত্তর, ভাল ভাল খাবার দেকে মনে হচ্ছিল এখেনে কত সুখ, কত আরাম। ভাবলাম স্বগ্‌গে এসে পড়েচি। কিন্তুন বাবু ফের বে করতে চলেচে, আপনার মেয়ে আপনার সন্‌গে সম্পক্ক রাকতে চাইচে না। বড্ড কষ্ট গ আপনার।'

অরূপ আর ঝিলিকের কথাই যে পারুল বলছে, সেটা বোঝা যায়। কে জানত, এই তিন দিনে নিজের হাজার বিপর্যয়ের মধ্যেও সব লক্ষ করেছে মেয়েটা। আজ দুপুরে যোধপুর পার্কে যেভাবে অপমানিত হয়ে শমিতা ট্যাক্সিতে ফিরে এসেছিল সেটা ওর নজর এড়িয়ে যায়নি। সেখান থেকে স্যুইটে এসে সুরজিতের কাছে নিজের জীবনের কথা যা যা বলেছে, মেয়েটা নিশ্চয়ই সমস্ত শুনেছে। এমন কি, অরূপের নতুন বিয়ে নিয়ে বিপাশার সঙ্গে তার কথাবার্তা আর খানিক আগে ঝিলিকের সঙ্গে যে আলোচনাটা হলো তাও সে শুনে থাকবে। লেখাপড়া শেখার সুযোগ না পেলেও মেয়েটা যে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী এবং তার অত্যন্ত কোমল একটি হৃদয়ও যে আছে সেটা আগেই জেনেছে শমিতা। এই মুহূর্তে আরো নিবিড় করে তা অনুভব করল।

শমিতা চুপ করে থাকে। যে বিপন্ন পারুলকে সে বাঁচিয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছে, পৃথিবীর কোনো প্রান্তেই যার দাঁড়াবার জায়গা নেই সে পর্যন্ত তার দুঃখে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তার জীবনের সকরুণ ইতিহাস ওর কাছে আর অজানা নেই। হঠাৎ শমিতার মনে হয় তার আর পারুলের মধ্যে আশ্চর্য রকমের মিল। তারা দু'জনেই বড় বেশি একা। নিদারুণ এক অনিশ্চয়তা তাদের যেন তাড়া করে নিয়ে চলেছে।

পারুল এ ঘরে চলে আসায় কান্নাটা থমকে গিয়েছিল শমিতার, ফের সেটা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

শমিতার কান্না পারুলের মধ্যেও চারিয়ে যেতে থাকে। সে বলে, 'কাঁদবেন না মেমসাহেব, কাঁদবেন না। আমি আপনার পায়ে হাত বুলোয়ে দিচ্চি, আপনি ঘুমান।'

পারুলের নরম দুটো হাত পাখির পালকের মতো পায়ের ওপর দিয়ে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। আরামে চোখ বুজে আসার কথা কিন্তু ঘুম আসছে না শমিতার। বরং কান্নাটা যেন বুকের ভেতরকার কোনো অজানা উৎস থেকে শতগুণ তীব্র হয়ে উঠে আসতে থাকে।

যে পারুলকে তিন দিন আগেও শমিতা চিনত না, তার দুঃখে সে এতটা কাতর, এতটা বিচলিত হয়ে পড়বে, কে ভাবতে পেরেছিল ! বিবাহবিচ্ছেদের পর এমন সহানুভূতি, এমন সেবাযত্ন শমিতা আর কারো কাছে পায়নি। হঠাৎ কী যে হয়ে যায় তার ! বিছানায় সোজা উঠে বসে, প্রবল আবেগে পারুলকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলে, 'পারুল, তুই আমার কাছে চিরকাল থাকবি ?' তার মনে হচ্ছিল, এই গেঁয়ো মেয়েটা ছাড়া বিপুল পৃথিবীতে তার আপনজন বলতে আর কেউ নেই।

শমিতার আবেগ পারুলকে যেন তোলপাড় করে ফেলে। দু-হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাজড়ানো ঝাপসা গলায় বলে, 'আমি তো থাকতেই চাই। আপনিই আজ সারাদিন আমাকে তাড়াবার জন্যি কুথায় কুথায় নে (নিয়ে) ঘুরেচেন।'

শমিতা আপ্লুত স্বরে বলে, 'আর কোথাও তোকে নিয়ে যাব না। তুই এখানেই থাকবি।' সে মনস্থির করে ফেলে, যত বিপদই আসুক, পারুলকে দু-হাত দিয়ে আগলে রাখবে, নিজের জন্যই ওকে রক্ষা করাটা একান্ত জরুরি।

এরপর অনেকক্ষণ দু'জনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে।

রাত আরো গাঢ় হয়। আশি ফিট নিচে ল্যান্সডাউন রোডের হইচই, গাড়ির আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসে। সমস্ত দিনের শেষে ক্লান্ত কলকাতা মেট্রোপলিস এবার ঘুমের অতলে ডুবে যাবে।

একসময় শমিতা বলে, 'অনেক রাত হলো। ও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় পারুল।'

পারুল বলে, 'না।'

'ঘুমোবি না ?'

'আপনি আগে ঘুমোন। তারপর আমি যাব।'

কী একটু ভাবে শমিতা। তারপর বলে, 'আচ্ছা। তুই যখন বলছিস—'

এই মুহূর্তে তার নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। পারুলের হাতে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেয় শমিতা।

গ্রামের মেয়ে হলেও পারুল তার প্রখর বোধশক্তি দিয়ে যেন বুঝতে পেরেছে বাইরে থেকে শমিতাকে যেমনই দেখাক, ভেতরে ভেতরে সে খুব অসহায়। কোনো কোনো সময় তার ওপর হয়তো খানিকটা জোর খাটানো

যায়। এমনও হতে পারে নিজের ভার অন্যের ওপর দিয়ে মানসিক চাপ থেকে কিছুক্ষণের জন্য শমিতা মুক্তি পেতে চায়।

শমিতার বাহুবেষ্টন থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার কাঁধ ধরে বিছানায় সযত্নে শুইয়ে দেয় পারুল। শিয়রের কাছে বসে তার কপালটা আস্তে আস্তে টিপে দিতে দিতে বলে, 'এবার ঘুমোন মেমসাহেব।'

শমিতা পারুলের কোমরের কাছটা আলতো করে জড়িয়ে ধরে বলে, 'মেমসাহেব না, তুই আমাকে দিদি বলবি।'

শমিতা তাকে 'দিদি' বলতে বলছে! আনন্দে, নাকি সুখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত উথলপাথল হয়ে যায় পারুলের। আচ্ছন্নের মতো সে বলে, 'তাই বলব দিদি—'

বার

আরো দিন কয়েক কেটে যায়।

এর মধ্যে পারুলের নিরাপত্তার জন্য প্লেন ড্রেস পুলিশ পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একদিন দুপুরে যখন শমিতা ব্যাঙ্কে গেছে সেই সময় গণপতি তার অ্যাপার্টমেন্টে পারুলের জন্য হানা দেয়। তখন পুলিশ তাদের ধরে ফেলে। এবং তাকে চাপ দিয়ে তাদের দলটার হদিশ পেয়ে যায়। গোটা গ্যাংটা এখন পুলিশ লক-আপে। শিগগিরই কোর্টে কেস উঠবে। তখন পারুল এবং শমিতাকে সাক্ষি দিতে যেতে হবে। মোটামুটি এই সমস্যাটা থেকে আপাতত তারা মুক্তি পেয়েছে। পারুলের ওপর হামলার ভয়টা আর নেই।

এদিকে নিরাপদ, নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে পারুল। এমনিতে সে ভীষণ আমুদে, ছটফটে, হাসিখুশি মেয়ে। এতদিন আতঙ্ক, ভয় এবং অনিশ্চয়তা যেন তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। সে সব কেটে যাবার পর তার স্বভাবটা যেন কোনো একটা খাপের ভেতর থেকে বেগবান স্বচ্ছ স্রোতের মতো বেরিয়ে এসেছে।

এই ক'দিনে ল্যান্সডাউন রোডের এই বিশাল স্যুইটটার পুরো কর্তৃত্ব চলে গেছে পারুলের হাতে। শুধু তাই না, স্যুইটের স্বত্বাধিকারিণীটিও তার কথায়

ওঠে, বসে। নিজেকে একরকম তার হাতে তুলে দিয়েছে শমিতা।

গ্যাসের উনুন জ্বালার প্রক্রিয়াটা এর ভেতর পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলেছে পারুল, শিখে নিয়েছে টেলিফোন ধরার কায়দাও। ভোর হতে-না-হতেই সে বেড-টি করে এনে শমিতার ঘুম ভাঙায়, তারপর ছোটাছুটি করে সবগুলো ঘর ঝাঁট দেয়, কার্পেটের তলা থেকে ধুলো বার করে। কাজের মেয়েটি অর্থাৎ মায়াকে ছাড়াতে চেয়েছিল সে, শমিতা রাজি হয়নি। সে এসে শুধু বাসন-কোসন মেজে আর ঘর মুছে চলে যায়।

মায়া চলে যাবার পর টোস্ট-অমলেট করে ডাইনিং টেবলে সাজিয়ে রাখে। ততক্ষণে মুখটুখ ধোওয়া শেষ শমিতার।

ব্রেকফাস্ট হয়ে গেলে কাপ-প্লেট কিচেনের সিঙ্কে রেখে রান্নার আয়োজন করতে থাকে পারুল। তার সঙ্গে শমিতাও কিচেনে আসে। কিন্তু কোনো কিছুতে তাকে হাত দিতে দেয় না মেয়েটা। একটা চেয়ার কি মোড়া এনে বলে, 'এটায় বসে কী রাঁদতে হবে, ক্যামুন করে রাঁদতে হবে, সেটা শুদুন দেকিযে দাও দিদি।' বিকেলে করে লুচি বা পরোটা। রাত্তিরে শুধু ভাত বা রুটি। সকালেই দু-বেলার মতো মাছ-ডাল-তরকারি-টরকারি করে বাড়তিটা ফ্রিজে রেখে দেয়। রাত্তিরে খাওয়ার আগে আগে গরম করে নেয়।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনবরত কথা বলে যায় পারুল। হাসির কথা, মজার কথা, তাদের দেশের নানারকম গল্প।

গল্প করতে করতে বেগুনি কি ফুলুরি ভেজে প্লেট বোঝাই করে মাঝে মাঝেই শমিতাকে দেয় পারুল। সেই সঙ্গে গরম এক কাপ চা। সে জেনে গেছে তেলেভাজাটা খুব পছন্দ করে শমিতা। রাত্তিরে যতক্ষণ না শমিতার ঘুম আসে, মাথায় কি পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়।

এই ক'দিন অফিসে যায়নি শমিতা। ফোন করে ছুটি বাড়িয়ে নিয়েছে।

সে বুঝতে পারছিল, পারুলের ওপর এই অল্প সময়ে সে যেন অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আসলে যদিও সে যথেষ্ট স্বাবলম্বী, চাকরির খাতিরে সারা ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়ায়, তবু তার মধ্যে একটি গৃহলোভী মন রয়েছে। ডিভোর্সের পর সেই মনটা যেন চাপা পড়ে গিয়েছিল।

পারুলের মধ্যে কোথায় যেন পরমাশ্চর্য এক ম্যাজিক রয়েছে। মাত্র এই

ক'দিনেই সে তার ছন্নছাড়া, উদ্‌ভ্রান্ত, অগোছালো জীবনে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে। যখন তখন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আগে বেরিয়ে যেত শমিতা। ফাঁকা ফ্ল্যাটে থাকতে একেবারেই ভাল লাগত না। এখন বেশ লাগছে। পাথরের তলা থেকে পারুল তার গৃহকাতর মনটাকে যেন বার করে এনেছে।

পারুল তার কাছে থেকে যাওয়ায় খুব খুশি হয়েছে সুরজিৎও। সে বলেছে, 'এর চেয়ে সুন্দর ব্যবস্থা আর হয় না। শী ইজ জেম অফ আ গার্ল। তুমি একা একা থাকো। পারুলের মতো একজন সঙ্গী পাশে থাকলে মন ভাল থাকবে, অনেকখানি সাহস পাবে।'

সুরজিতের মতো বন্ধু পাওয়া যায় না। এমন নিঃস্বার্থ, পরোপকারী মানুষ আগে আর দেখেনি শমিতা। এই ক'দিনে সে তার খুব কাছে এসে পড়েছে। তাকে 'তুমি' করে বলতে শুরু করেছে।

পাঁচদিন পর আজ অফিসে যাবে শমিতা। গাড়ি ঠিক সময়ে এসে নিচে অপেক্ষা করছে।

শমিতা পারুলকে বলে, 'বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে যাব। তুই ঠিক সময়ে খেয়ে নিস। ইচ্ছে হলে দুপুরে ঘুমোস। ইচ্ছে হলে রাস্তার দিকের জানলার পাশে বসতে পারিস। এখন আর ভয় নেই। আমি সন্ধের আগেই ফিরে আসব।'

পারুল বলে, 'দুপুরে এসে তুমি খাবে না?'

'তুই তো জানিস আমি দুপুরে অফিসে খাই, রাত্তিরে একসঙ্গে খাব।'

'আমি এত কষ্ট করে রান্না করলুম। দুপুরে এসে খেয়ে যেতিই হবে, না এলে আমি কিন্তুন খাব না।'

শমিতা দ্রুত ভেবে নেয়, লাঞ্চ ব্রেকের জন্য তারা বেশ খানিকটা সময় পায়। তার ভেতর স্যুইটে এসে স্বচ্ছন্দে খেয়ে যেতে পারবে। বলে, 'ঠিক আছে বাবা, তাই হবে। তোকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

পারুল চোখ কুঁচকে একটু হাসে। সেই হাসিতে খুশি এবং তৃপ্তি মেশানো।

শমিতা বলে, 'আর শোন, তেমন কিছু দরকার হলে অফিসে আমাকে ফোন করে দিবি।'

'আচ্ছা—' মাথা হেলিয়ে দেয় পারুল।

অফিসে আসতেই টেবলের ওপর একটা চিরকুট পেল শমিতা। আজ এগারটায় ভাইস প্রেসিডেণ্ট চক্রবর্তী সাহেব তাঁর চেম্বারে তাকে দেখা করতে বলেছেন।

ক'দিন অফিসে না আসার কারণে টেবলে প্রচুর ফাইল জমে গিয়েছিল। এক গেলাস জল খেয়ে দ্রুত সেগুলোর ভেতর ডুবে যায় শমিতা। প্রতিটি ফাইল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে পাশে জরুরি নোট দিতে থাকে।

এগারটা বাজতে যখন তিন মিনিট বাকি, উঠে পড়ে শমিতা। ক্লার্ক আর টাইপিস্টদের লম্বা হল পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে পাঁচ তলায় সোজা ভাইস প্রেসিডেন্টের চেম্বারে চলে আসে। তখন কাঁটায় কাঁটায় এগারটা। সময়ের ব্যাপারে সে ভীষণ সচেতন।

শুধু চক্রবর্তী সাহেবই না, জেনারেল ম্যানেজার এবং প্রোডাকশন কন্ট্রোলারও শমিতার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

চক্রবর্তী সাহেব বলেন, 'তুমি ক'দিন অফিসে না আসায় খুব অসুবিধা হয়েছে। বম্বে থেকে প্রচুর এনকোয়ারি আসছে। বম্বেতে কার সঙ্গে কী বিজনেস ডিল হবে সেটা তুমি ছাড়া অফিসের আর কেউ পরিস্কারভাবে জানে না। ফলে উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না।'

'স্যার, আমি তো অফিসকে জানিয়েই ছুটি নিয়েছি।'

'সেটা ঠিক আছে। এর ভেতর কী হয়েছে তা তোমাকে জানালাম।'

শমিতা চুপ করে থাকে।

প্রোডাকশন কন্ট্রোলার আর জেনারেল ম্যানেজারকে দেখিয়ে চক্রবর্তী সাহেব বলেন, 'ওঁদের সঙ্গে কাল আমি মিটিং করেছিলাম। তোমার সম্পর্কে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেটা জানাবার জন্যে আজ তোমাকে ডেকেছি। অবশ্য আমাদের ডিসিসানের ব্যাপারে তোমার মতামতটাও জানতে চাইব।'

উৎসুক চোখে তাকায় শমিতা। ভেতরে ভেতরে একটু উৎকণ্ঠাও বোধ করে। কী সিদ্ধান্ত ওঁরা তার ওপর চাপাতে চাইছেন কে জানে।

চক্রবর্তী সাহেব বলেন, 'বম্বের মার্কেট থেকে যেভাবে রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে, অবশ্য সবটাই তোমার হার্ড লেবারের জন্যে— তাতে অন্তত মাস তিনেক তোমাকে ওখানে গিয়ে থাকতে হবে। বাজারটা খুব ভাল করে

ক্যাপচার করা দরকার।'

শমিতা চমকে ওঠে। পারুলের মুখটা চোখের সামনে পলকের জন্য ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। সে বলে, 'কিন্তু স্যার—'

'কী ?'

'আমার পক্ষে এখন বম্বে গিয়ে একসঙ্গে তিন মাস থাকার একটু অসুবিধে আছে।'

চক্রবর্তী সাহেবের কপাল কুঁচকে যায়। শমিতা যে সোজাসুজি না বলে দেবে, এটা তিনি ভাবতে পারেননি। জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি তো একা থাকো। সংসারের কোনোরকম ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট নেই। তোমার কাছে কলকাতাও যা বম্বেও তা-ই। অসুবিধেটা কী ?'

খানিক ইতস্তত করে শমিতা। একবার ভাবে পারুলের কথা জানিয়ে দেবে। পরমুহূর্তে স্থির করে ফেলে আপাতত না বলাই ভাল। বললে পারুল সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠবে। সে সবের উত্তর দিতে এখন ভাল লাগছে না। শমিতা শুধু বলে, 'আমার পার্সোনাল একটা প্রবলেম আছে।'

চক্রবর্তী সাহেব জীবনে অফিস ছাড়া কিছুই বোঝেন না। গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেসা করেন, 'একটা শর্তের কথা কি তোমার মনে আছে ?'

শমিতা বলে, 'আছে স্যার। সেলসের ব্যাপারে কোম্পানি যখন যেখানে যেতে বলবে তাতেই রাজি হব, এই কন্ডিশনে আমাকে প্রোমোশন দেওয়া হয়েছিল।'

'তা হলে ?'

'আমি এতদিন সব শর্ত মেনে এসেছি। কখনও আমার দিক থেকে ত্রুটি হয়েছে বলে মনে হয় না।'

'দ্যাটস রাইট। আই অ্যাডমিট। কিন্তু—'

'কী ?'

চক্রবর্তী সাহেব জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার প্রবলেমটা কী ধরনের ? আমরা কি সাহায্য করতে পারি না ?'

খুব বিনীতভাবে শমিতা বলে, 'নো স্যার। আই ডোন্ট থিংক সো।'

এই কোম্পানির প্রায় সবাই জানে শমিতা ডিভোর্সি, একেবারে ঝাড়া হাত-পা, বন্ধন বলতে তার কিছু নেই। জেনারেল ম্যানেজার, সংক্ষেপে

জি. এম. বললেন, 'য়ু আর কোয়াইট অ্যালোন, তোমার আবার কী প্রবলেম থাকতে পারে ?'

শমিতা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বিনীতভাবে বলে, 'একা হলেই যে প্রবলেম থাকবে না তেমন কোনো নিয়ম তো নেই।'

চক্রবর্তী সাহেব দারুণ বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে শমিতাকে কাজের ব্যাপারে কখনও কিছু বলতে হয় না, কোম্পানির স্বার্থে যে সকালের ফ্লাইটে বম্বে গিয়ে সেদিনই ওখান থেকে বাঙ্গালোর উড়ে যায় সে নিশ্চয়ই এমন কোনো সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে যাতে কলকাতা ছাড়া এখন তার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু চাপ দিলেই চলে না, কোম্পানির তরফ থেকে শমিতার সুবিধা-অসুবিধার দিকটাও দেখা দরকার।

চক্রবর্তী সাহেব বলেন, 'তোমার প্রবলেমের কথা জানতে চাই না। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে। যাই হোক, আপাতত তোমাকে বম্বে যেতে হবে না। তোমার নেক্সট ম্যান মৌলিকই যাক। ওখানে কী কী করতে হবে, কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, সব ওকে বুঝিয়ে দিও। মৌলিক বম্বে পৌঁছুবার পর ফ্যাক্সে বা ফোনে রেগুলার তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। কী করতে হবে, তুমি তাকে বুঝিয়ে দেবে।'

'নিশ্চয়ই স্যার। মৌলিক কমপিটেন্ট অফিসার, কোনো অসুবিধে হবে না, কাজটা ও ভালই করবে।'

একটু চুপ।

তারপর চক্রবর্তী সাহেব জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার প্রবলেমটা কবে মিটবে বলে মনে হয় ?'

শমিতা বলে, 'বুঝতে পারছি না স্যার।'

'তার মানে কি এটাই ধরে নেবো, যতদিন তোমার প্রবলেমটা আছে, কলকাতার বাইরে যেতে পারবে না ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

চক্রবর্তী সাহেবকে বেশ চিন্তিত দেখায়। তিনি ভেবে উঠতে পারছেন না কতদিনে শমিতা সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। শুধু বললেন, 'ভারি মুশকিল হলো তো।'

শমিতা উত্তর দেয় না।

চক্রবর্তী সাহেব একটু ভেবে এবার বলেন, 'যত তাড়াতাড়ি পার সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলতে চেষ্টা কর।'

শমিতা বলে, 'করব স্যার। তবে—'

'কী ?'

'সেলসের কাজ আর কতদিন করতে পারব, বুঝতে পারছি না।'

চক্রবর্তী সাহেব চকিত হয়ে ওঠেন। শমিতার মতো সারভিস আর কোনো সেলস একজিকিউটিভের কাছ থেকে এই কোম্পানি কখনও পায়নি। ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার বিজনেস এনে দিয়েছে সে। কোম্পানির রমরমা অবস্থার পেছনে শমিতার বিরাট কনট্রিবিউশান। তার মেধা, তার বুদ্ধি, তার পরিশ্রমের ক্ষমতা এই প্রতিষ্ঠানের বিরাট অ্যাসেট।

চক্রবর্তী সাহেব বিমূঢ়ের মতো বলেন, 'তার মানে ?'

'আমার বাইরে বাইরে ঘোরা বোধহয় আর সম্ভব হবে না।'

'ওসব চিন্তা মাথা থেকে বার করে দাও। তোমার কাছে আমাদের কত এক্সপেক্টেশান জানো ?'

শমিতা চুপ করে থাকে।

চক্রবর্তী সাহেব বলেন, 'ঠিক আছে, কথা তো হলো। এখন তুমি তোমার চেম্বারে যাও।'

নিচে এসে শমিতা দেখল, টেবলের ওপর একটা ইনভিটেশন কার্ড পড়ে আছে। একটা বড় মাল্টি-ন্যাশনাল ফার্ম সেন্ট্রাল ক্যালকাটার এক ফাইভ-স্টার হোটেলে আজ ডিনার পার্টির ব্যবস্থা করেছে, এটা তারই নেমন্তন্নের চিঠি। ঐ কোম্পানিটার পাবলিক রিলেশানস ম্যানেজার অভিজিৎ দত্ত শমিতার খুব বন্ধু, নেমন্তন্নটা তার কাছ থেকেই এসেছে। অভিজিতের দারুণ ইচ্ছা, তাদের কোম্পানিতে শমিতা জয়েন করুক। স্যালারি, গাড়ি, ফ্ল্যাট, ফোন, ট্র্যাভেল আর মেডিক্যাল এক্সপেন্সেস মিলিয়ে যে প্যাকেজ ওরা দিতে চাইছে তার অঙ্কটা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। কিন্তু শমিতা এখনও অবিচলিত আছে। নিজের কোম্পানিতে সে যা পায় তাতে রাজার হালে থাকতে পারে। টাকা-পয়সার ওপর তার বিশেষ মোহ নেই।

কার্ডটা দেখতে দেখতে পারুলের মুখ আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পার্টিতে যাওয়া মানে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। না,

এতটা সময় একা একা পারুলকে স্যুইটে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। গণপতিরা ধরা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু কলকাতা শহরে গণপতিদের অভাব নেই। তারা টের পেয়ে গেলে নতুন করে মেয়েটার বিপদ ঘটে যাবে।

শমিতা ঠিক করে ফেলে, পার্টিতে যাবে না। সেটা জানিয়ে দেবার জন্য অভিজিৎকে ফোন করে, 'আমাকে ক্ষমা করতে হবে ভাই, তোমার পার্টিতে আজ যাওয়া হচ্ছে না।'

কর্পোরেট হাউস পার্টি দেবে, আর আমন্ত্রিত হয়েও শমিতা যাবে না, এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। অবাক হয়ে অভিজিৎ বলে, 'কী ব্যাপার, আসবে না কেন ?'

'আমার অন্য একটা কাজ পড়ে গেছে ঐ সময়টায়।'

'কাজটা অন্য সময় করে নিও। প্লিজ সন্ধেবেলায় চলে এস।'

'অন্য সময় করা যাবে না। বিশ্বাস কর, আজ আমার পক্ষে যাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, সারাক্ষণ না থাকতে চাও, আধ ঘণ্টার জন্যে অন্তত এস। জাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার।'

'আধ ঘণ্টা কেন, দশ মিনিটের জন্যেও যেতে পারব না। আমার কাজটা খুবই আর্জেণ্ট। প্লিজ কিছু মনে করো না।'

অভিজিৎ বলে, 'কিন্তু আমার একটা প্ল্যান ছিল যে—' তার গলা শুনে মনে হয় খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

শমিতা জিজ্ঞেস কর, 'কী প্ল্যান ?'

'আমাদের ভাইস প্রেসিডেণ্ট তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। ভেবেছিলাম পার্টিতে এলে পরিচয় করিয়ে দেব। কাজের কথাটাও সেই সময় হয়ে যাবে।'

অর্থাৎ অভিজিৎরা এখনও আশা ছাড়েনি। যেভাবেই হোক ওরা তাকে তাদের কোম্পানিতে নিয়ে যেতে চাইছে। শমিতা বলে, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, এই মুহূর্তে যে অফিসে আছি সেটা ছাড়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। ভবিষ্যতে যদি চেঞ্জের কথা ভাবি, তোমাকে জানাব।'

হতাশার সুরে অভিজিৎ বলে, 'ভাইস প্রেসিডেণ্টকে বলেছিলাম আজ তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো। একটা ভারি অকোয়ার্ড পজিশনে পড়ে গেলাম।'

শমিতা বলে, 'তোমার যাতে মুখরক্ষা হয় সেই ব্যবস্থা আমি করব। নেক্সট উইকে একদিন তোমাদের ভাইস্ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে আসব।'

'ঠিক আসবে তো ?'

'ওয়ার্ড অব অনার। আরেকটা কথা—'

'কী ?'

'আমি যদি এই অফিস কখনও ছাড়ি তোমাদের কথাই প্রথম ভাবব।'

'থ্যাঙ্ক য়ু, থ্যাঙ্ক য়ু ভেরি মাচ।'

অভিজিৎ লাইন ছেড়ে দিল।

তারপর পাঁচটা পর্যন্ত ঘাড় গুঁজে একটানা কাজ করে গেল শমিতা। মাঝখানে লাঞ্চ ব্রেকের সময় একবার শুধু তার স্যুইটে গিয়ে খেয়ে এসেছিল। ছুটির পর সোজা সেখানেই ফিরে গেল সে।

তের

আরো কয়েক দিন কেটে যায়।

জীবনযাপনের পদ্ধতিটা বড় দ্রুত বদলে যাচ্ছে শমিতার। অফিসের সময়টুকু ছাড়া বাকি দিনটা সে তার স্যুইটেই থাকে। পারুল তাকে নানা দিক থেকে জড়িয়ে ফেলেছে।

পার্টি, ড্রিংক সেসান, কোথাও আজকাল যায় না শমিতা। আগে বন্ধুবান্ধবরা এসে তার স্যুইটে আসর জমাত, কিংবা সেও যেত তাদের বাড়ি। মাঝরাত পর্যন্ত তুমুল হুল্লোড়ের মধ্যে কেটে যেত। এখন সে সব বন্ধ। বন্ধুরা বলে, তার চরিত্রে নাকি একটা কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ অর্থাৎ গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে।

কিন্তু তার যা কাজ তাতে সাধারণ কেরানিদের মতো দশটা-পাঁচটা অফিস করলে চলে না। কোম্পানি তাকে প্রচুর দেয়, তার কাছে ওদের অনেক প্রত্যাশা। বেশ কিছুদিন বম্বে যাওয়াটা ঠেকিয়ে রেখেছে সে কিন্তু আর কতদিন ? একমাস কি দু'মাস পর অফিস কোনো কথা শুনতে চাইবে না, বাইরে যেতে বাধ্য করবে। রাজি না হলে চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু

সেটা তো আর সম্ভব না। অভিজিৎদের অফিসে একবার হ্যাঁ বললে পরের দিনই সে জয়েন করতে পারে। কিন্তু ওরাও তাকে কলকাতায় বসিয়ে রাখবে না, সেলসের কাজে সারা ইন্ডিয়া ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াবে। চাকরিবাকরি নিয়ে একটা সংকট ঘনিয়ে আসছে যেন।

এ যেমন একটা দিক, পারুলের ব্যাপারেও নানা দুশ্চিন্তা ইদানীং শমিতাকে ভারাক্রান্ত করে রাখে। মেয়েটা চমৎকার, তার সেবাযত্নের তুলনা নেই। কিন্তু চিরকাল তো ওকে ঘরের ভেতর আটকে রাখা যাবে না। ওর একটা ভবিষ্যৎ আছে। যদি কোথাও একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেত খুব ভাল হতো। তার কাছেই থাকবে পারুল কিন্তু ওর স্বাবলম্বী হওয়াটা জরুরি।

শমিতা ভাবে, কত অঘটনই তো জীবনে ঘটে। যদি তার নিজের কিছু হয়ে যায়, কোথায় দাঁড়াবে মেয়েটা ? কে দেখবে তাকে ? কিন্তু কাজ যে যোগাড় করে দেবে, তারও তো উপায় নেই। ও লেখাপড়াই জানে না যে চাকরি হবে।

পারুলকে নিয়ে সুরজিতের সঙ্গে এর ভেতর অনেক আলোচনা হয়েছে। সুরজিৎ তাকে একটা ভাল পরামর্শ দিয়েছে। আজকাল মেয়েদের হাতের কাজ শেখার জন্য অসংখ্য সেণ্টার খোলা হয়েছে। তার কোনো একটায় ভর্তি করে দিলে পারুল কাজ শিখে রোজগারও করতে পারবে, অনেক সঙ্গীও পাবে। সময়টা চমৎকার কেটে যাবে। কাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে একজন প্রাইভেট টিউটরও রাখতে বলেছে সুরজিৎ। হাতের কাজের সঙ্গে লেখাপড়াটা শিখে নিতে পারলে তো কথাই নেই। শমিতা ঠিক করে ফেলেছে যত তাড়াতাড়ি পারে একটা ট্রেনিং সেণ্টারে ভর্তি করে দেবে পারুলকে, একজন প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গেও কথাবার্তা চলছে।

এই যখন অবস্থা সেই সময় চূড়ান্ত দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। অন্য দিনের মতো আজও অফিস থেকে ছ'টার আগেই ফিরে এসেছিল শমিতা। হাতমুখ ধুয়ে পোশাকটোশাক পাল্টে চা খেয়ে পারুলকে নিয়ে টিভি দেখতে বসেছিল। আজ স্টার টিভিতে একটা দুর্দান্ত ফিল্ম দেখানো হবে। খুন, কিডন্যাপিং, রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা জমজমাট হলিউডের এই ছবিটা দেখার জন্য উদগ্রীব

হয়ে ছিল শমিতা। ইয়োরোপ আমেরিকায় ফিল্মটা নাকি একেবারে ঝড় বইয়ে দিয়েছে। এদেশে ওটা হল-এ রিলিজ করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কেবল টিভিতে ক'দিন আগে যখন অ্যানাউন্স করা হলো ছবিটা দেখানো হবে, শমিতা প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল। সে ক্রাইম স্টোরি আর ক্রাইম ফিল্মের পোকা।

ছবিটা শুরু হয়েছিল সাড়ে সাতটায়, শেষ হবে দশটায়। ঘণ্টাখানেক চলার পর তিনটে মার্ডার করে হত্যাকারী যখন ছদ্মবেশে নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসে পালাচ্ছে আর ডিটেকটিভ প্লেনে তার পিছু নিয়েছে, অর্থাৎ উত্তেজনা যখন টানটান, হঠাৎ কলিং বেল বেজে ওঠে।

শমিতার চোখের পাতা পড়ছিল না। দম বন্ধ করে দেখে গেলেও বেলের আওয়াজটা তার কানে এসেছিল। বিরক্ত সুরে বলে, 'দ্যাখ তো পারুল—'

পারুল দরজা খুলে দিতেই যে ভেতরে ঢুকল, মাঝখানের নানা ঘটনায় তার কথা মনে ছিল না শমিতার। সে চমকে উঠে দাঁড়ায়, 'এ কী, রাহুল তুমি!'

রাহুলের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। সাড়ে ছ ফিটের মতো হাইট। রং তামাটে। চৌকো মুখ, ভারি চোয়াল, পুরু কালচে ঠোঁট, ছড়ানো নাক। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে তার প্রচণ্ড মজবুত শরীর। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায় লোকটার শরীরে অসীম শক্তি। তার চোখে, মুখে, চোয়ালে একটা জান্তব ব্যাপার আছে। তার পরনে ক্রিম রংয়ের দামি সাফারি স্যুট, চোখে হালকা নীল চশমা।

রাহুল ক'পা এগিয়ে আসে। ঠোঁট ফাঁক করে নিঃশব্দে হাসে। বলে, 'হ্যাঁ আমিই। তোমাকে ফোন করে কয়েক উইক আগে বলেছিলাম না আমি কলকাতায় ফিরে আসছি। কাল ফিরেছি। আজ এখানকার অফিসে রিপোর্ট করেছি। ভাবলাম, দেরি করার মানে হয় না, তাই চলে এলাম।'

ভেতরে ভেতরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে শমিতা। কিন্তু রাহুল টের পাক সেটা একেবারেই চায় না। রুক্ষ গলায় বলে, 'কতবার বলেছি তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমাকে ডিস্টার্ব করবে না।'

'তোমার দিক থেকে ইউ আর রাইট। কিন্তু আমি তো খুব ইগারলি সম্পর্কটা রাখতে চাইছি ম্যাডাম—'

এদিকে পায়ে পায়ে কিচেনে চলে গিয়েছিল পারুল। শমিতার কাছে কেউ

এলে সে অন্য ঘরে চলে যায়। সে বুঝতে পারছিল শমিতা রাহুল নামের ঐ লোকটাকে পছন্দ করে না।

শমিতা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'হেল উইদ ইয়োর সম্পর্ক। লিভ দিস প্লেস রাইট নাউ।'

অমন চাঁছাছোলা ভাষায় বলার পরও রাহুল কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, 'চলে যাবার জন্যে কিন্তু আমি আসিনি।' বলতে বলতে একটা সোফায় বসে পড়ে সে।

অসহ্য রাগে শরীরের সব রক্ত যেন মাথায় উঠে আসে শমিতার। তীব্র গলায় সে বলে, 'তুমি এখান থেকে যাবে কিনা আমি জানতে চাই।'

'ও নো। অত উত্তেজিত হয়ো না। এতদিন পর দেখা হলো, রাগারাগি করাটা কি ভাল দেখায়? ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। বসো।'

'তুমি যদি এই মুহূর্তে না যাও, আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কী করবে, চেঁচিয়ে লোক ডাকবে?'

'হ্যাঁ, তাই ডাকব।'

'ডাকতে পার। তুমি ডিভোর্স করেছ, একা একা থাকো। প্রচুর পুরুষ বন্ধু তোমার। তোমাকে নিয়ে কত যে স্ক্যান্ডাল তার হিসেব নেই। লোকজন এলে বলব, তুমি আমাকে এখানে রাত কাটাবার জন্যে ডেকে এনেছ।'

শমিতা চমকে ওঠে। বলে, 'আমি তোমাক ডেকে এনেছি!'

'কক্ষণো না।' চোখ সরু করে রাহুল বলে।

'তা হলে এরকম জঘন্য মিথ্যেটা বলবে কেন?'

'আত্মরক্ষার জন্যে।'

'আমার সর্বনাশ করে?'

'নিজেকে বাঁচাতে হলে তোমার কিছু ক্ষতি তো করতেই হবে।'

'আমি তোমার আর কোনো কথা শুনতে চাই না। গেট আউট, আই সে গেট আউট।'

শমিতা যতটা ক্ষিপ্ত, ঠিক ততটাই উত্তেজনাহীন রাহুল। উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে হাসতে থাকে সে।

টিভিতে এখন একটা দমবন্ধ-করা অ্যাকশানের দৃশ্য চলছে, তার সঙ্গে চড়া সুরের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। গলার স্বর তার ওপর চড়িয়ে শমিতা

চেঁচায়, 'তুমি এখান থেকে যাবে না?'

'বলামাত্র চলে যাবার জন্যে তো আসিনি।'

'বীস্ট!'

'কারেক্ট। আমার সম্বন্ধে এর চেয়ে উপযুক্ত শব্দ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজে তৈরি হয়নি।'

'আই হেট ইউ, আই হেট ইউ—'

'তুমি যা খুশি করতে পার। আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না।'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় রাহুল। তার মুখের চেহারা মুহূর্তে বদলে যায়, চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে আদিম লালসা, তার সঙ্গে অদ্ভুত এক নিষ্ঠুরতা। পায়ে পায়ে শমিতার দিকে এগিয়ে যায় সে।

শমিতা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। রাহুলের দিকে চোখ রেখে পিছু হটতে হটতে শিথিল গলায় বলে, 'কী—কী চাও তুমি?'

রাহুল বলে, 'ইয়োর বিউটিফুল বডি—'

'না, না—'

আতঙ্কিত শমিতা উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেডরুমের দিকে দৌড়ে যায়। তার ধাক্কা লেগে টিভিটা টেবলের ওপর থেকে ছিটকে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেটার ভেতর থেকে গাঁক গাঁক করে বিচিত্র সব আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকে।

শেষরক্ষা কিন্তু হয় না। শমিতা ভেবেছিল, শোবার ঘরে গিয়ে দরজা লক করে দেবে কিন্তু তার আগেই রাহুল হিংস্র জানোয়ারে মতো সেখানে ঢুকে পড়ে।

কিচেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল পারুল। সীমাহীন ত্রাসে তার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেছে। এয়ারপোর্টে গণপতিরা তাকে যেভাবে ধাওয়া করেছিল, এই দৃশ্যটা প্রায় সেইরকম। সে না হয় গাঁয়ের মেয়ে, লেখাপড়া জানে না, ভীরু এবং অসহায়, কিন্তু শমিতার মতো শহরের মহিলাদেরও রেহাই নেই। গণপতির মতো লোকেরা সারা পৃথিবী জুড়ে ওত পেতে আছে।

দেখতে দেখতে হঠাৎ আমূল বদলে যায় পারুল। তার বুকের ভেতরের ভয়টা মুহূর্তে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরকে পরিণত হয়। শমিতাকে বাঁচানোর জন্য তাকে কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু কী করবে সে, কী করা তার পক্ষে

সম্ভব ? এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে গ্যাস-ওভেনের পাশে বড় ধারাল ছুরিটা দেখতে পায়। ওটার মুখ খুব ছুঁচলো। এ বাড়িতে বঁটি-টটি নেই, ঐ ছুরিটা দিয়ে আনাজ কাটা হয়। আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে সেটা তুলে নিয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে শমিতার বেডরুমে চলে আসে পারুল।

ততক্ষণে রাহুল শমিতার জামা এবং ব্রা ছিঁড়ে ফালা ফালা করে তাকে বিছানায় ফেলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছে শমিতা, শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে সমানে পা ছুঁড়ছে। হাত দিয়ে রাহুলকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে। সেই সঙ্গে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসছে তার গলার ভেতর থেকে, 'ছাড়—ছাড়—জানোয়ার—'

অন্ধের মতো খাটের কাছে এগিয়ে আসে পারুল। তারপর বুঝি বা নিজের অজান্তেই শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে ছুরির গোটা ফলাটা চোখের পলকে রাহুলের পিঠে ঢুকিয়ে দেয়।

আর্ত চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ফোয়ারার মতো রক্ত ছুটে সারা ঘর ভেসে যায়। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায় রাহুল, তারপর ঠিকরে গিয়ে পড়ে মেঝেতে। তার শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। তার গলা চিরে ক্রমাগত কাতর আওয়াজ বেরিয়ে আসে, 'আ—আ—আ—'

অনেকক্ষণ কাতরানির পর রাহুল চিরকালের মতো চুপ হয়ে যায়। তার দেহ এখন একেবারে স্থির।

তারপর অনেকটা সময় কেটে গেছে। এমন এক মারাত্মক ঘটনায় একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল শমিতা। নিজেকে সামলে নিয়ে পরে সে সুরজিৎকে ফোন করে। সুরজিৎ এসে পুলিশকে সমস্ত ব্যাপার জানায়।

এখন মধ্যরাত। রাহুলের মৃতদেহ পোস্ট মর্টেমের জন্য আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন পুলিশ ভ্যানে থানায় চলেছে পারুল। তার পাশে সুরজিৎ আর শমিতা।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চলার পর পারুল বলে, 'আমার ফাঁসি হয়ে যাবে, না দিদি ?'

শমিতা চমকে ওঠে, 'না না, কিচ্ছু হবে না। কেন তুই লোকটাকে মারলি

জজসাহেব বুঝবেন।'

এবার সুরজিতের দিকে ফিরে পারুল বলে, 'পুলিশে তো আমারে ধরে নে যাচ্ছে। আমি তো কাচে থাকবনি। আপনি দিদিরে দেকবেন। দিদি বড় দুখী।'

শমিতা পলকহীন পারুলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে এই মেয়েটিকে ছাড়া বাকি জীবন তার চলবে না। যেভাবেই হোক ওকে মুক্ত করে আনতেই হবে।

একদিন এয়ারপোর্ট থেকে সে পারুলকে উদ্ধার করে এনেছিল। আজ মেয়েটা তার শতগুণ প্রতিদান দিল। চিরকালের মতো একটা জন্তুর হাত থেকে সে তাকে রক্ষা করেছে। কৃতজ্ঞতায় আবেগে শমিতার দু চোখ জলে ভরে যায়।